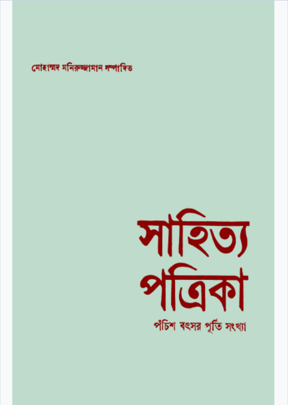

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান সম্পাদিত

সাহিত্য পত্রিকা

পঁচিশ বৎসর পূর্তি সংখ্যা

Vol. 25 | No. 2 | 1982

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আমাদের কবিতায় অস্তিত্বের অভীপ্সা

Volume	25
Issue	2
Year	1982
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	আজীজুল হক
Published online	April 1, 1982
DOI	10.62328/sp.v25i2.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v25i2.7
Pages	121-150
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বাংলা বিভাগ ।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Check for updates

আমাদের কবিতায় অস্তিত্বের অভীপ্সা

আজীজুল হক

পূর্ব-প্রসঙ্গ

কবিতা আপনাতে-আপনি সম্পূর্ণ কোনো পরিণাম নয়, কবিতা জীবনের নিগূঢ়তম অভীষ্ট সিদ্ধির শিল্পসুন্দর উপায় বিশেষ। এবং কবির ভূমিকা হচ্ছে বস্তুজগৎ মণ্ডলিত প্রতিবেশ-প্রতিপার্শ্ব ও সমকাল, অর্থাৎ এক বিশেষ কালের সামাজিক অবস্থা ও সম্পর্কে বিধৃত ব্যক্তিমানুষ ও সামাজিক মানুষের জীবন-অস্তিত্বের স্বরূপ আবিষ্কার-অনুসন্ধান করা, উদ্‌ঘাটিত অস্তিত্বকে অনুভব করা এবং অস্তিত্বের সম্ভাবনাময় প্রগতিশীল বিকাশে তাৎপর্য-ব্যঞ্জনাময় প্রেরণাদানের উদ্দেশ্যে সেই অনুভবকে শিল্পসঙ্গতভাবে ভাষায় প্রকাশ করা। কবিতা অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনসত্য ও পরিকল্পিত জীবনভাবনার অদ্বৈত ও শিল্প-ব্যঞ্জনাময় সচেতন প্রকাশ। সুতরাং কবি একই সঙ্গে বিষয়-সচেতন, ভাষা-সচেতন এবং উদ্দেশ্য-সচেতন। উদ্‌ঘাটিত-অনুভূত জীবনসত্যই তাঁর বিষয়, ভাষামূর্তিতে সেই অনুভবের আত্মপ্রকাশ, এবং সক্রিয় ভাব-প্রেরণাদানই তাঁর লক্ষ্য। কবিতা প্রসঙ্গে উচ্চারিত সুন্দর, কল্যাণ, সত্য, আনন্দ ইত্যাদি ধারণাগুলো রহস্যজটিল অতীন্দ্রিয় কোনো ধারণা নয়। কবির ব্যক্তিচিত্তে স্পন্দিত জীবনানুভব সামাজিক সহানুভূতি ও অনুমোদন লাভের জন্য শব্দধ্বনি প্রাণময় ভাষামূর্তি গ্রহণ করে। কবিতার এই আবেদন সমাজচিত্তের ক্রমবিকাশ ও ব্যাপ্তির অনুকূল বলে বিবেচিত হলে তা' সত্য, সুন্দর ও কল্যাণকর বলে সমাজস্বীকৃতি লাভ করে। কবিতা রচনা ও পাঠের আনন্দ তাই বহুর সঙ্গে একের এবং একের সঙ্গে বহুর মিলনের আনন্দ। সত্তার রহস্য উদ্‌ঘাটনে কৌতূহলী কবির যে আনন্দ, তা' সত্তাকে আবিষ্কারের বা উন্মোচনের আনন্দ; তাকে অনুভব ও উপভোগের আনন্দ, এবং প্রেরণাদানের সাফল্যলাভ, অর্থাৎ সমাজস্বীকৃতি লাভের, এবং এ-ভাবে সমষ্টির সত্তার সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার মিলনের আনন্দ।

সুতরাং ব্যক্তিজীবন ও সামাজিক জীবনের নিগূঢ় প্রয়োজন ও অভীপ্সাবোধই কবিতার মূল প্রেরণা। এই প্রয়োজন-পরিস্থিতি ও তার শর্তাবলীর সম্পূর্ণ বাইরে গিয়ে কবিতা কখনো সঙ্গত অবয়ব ধারণ করতে পারে না। জীবন-অস্তিত্বের প্রয়োজনের সঙ্গে জড়িত থাকায় এবং মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবন নিরন্তর সংঘর্ষমুখর হওয়ায় মানবিক প্রয়োজনচেতনার বাইরে স্থান-কাল-পাত্র-নিরপেক্ষ কোনো অলৌকিক শৈল্পিক মুক্তি অর্জন করা কবিতার পক্ষে সম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে বিশুদ্ধ কবিতা, বিমূর্ত কবিতা, বা শিল্পানন্দসর্বস্ব কবিতার বাষ্পবায়ুস্ফীত ধারণাসমূহ স্ববিরুদ্ধ ও স্বেচ্ছাখেয়ালী বলে বিবেচিত হবার যোগ্য।

জীবনের মৌলিক অভীপ্সাচেতনা ও সমাজচেতনা, এ-দু'য়ের পারস্পারিক সম্পর্ক প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, প্রথমটি হচ্ছে জীবনের অস্তিত্বকে রক্ষার ও তার প্রবৃদ্ধি ও বিকাশসাধনের সহজাত আকাঙ্ক্ষাচেতনা, এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণের

উদ্দেশ্যে জীবন-মূল্যবোধভিত্তিক সমাজ সংগঠনের তাৎপর্য উপলব্ধি, বিশেষ কালের সমাজব্যবস্থা, পরিপার্শ্ব, প্রতিবেশ ও পরিস্থিতির ভেতরে বিদ্যমান ব্যক্তি, শ্রেণী ও সমষ্টির অস্তিত্বের, এবং তাদের পারস্পারিক দ্বন্দ্বময় সম্পর্কের প্রেক্ষিতে সেই মৌলিক আকাঙক্ষা ও মূল্যবোধের তৎকালীন স্বরূপ ও পরিণামচেতনা। অভীপ্সাই জীবন, এবং এই জীবনের সম্ভাব্য চূড়ান্ত শুভ-পরিণাম অর্জিত হতে পারে কেবল সুসমঞ্জস সাংগঠনিক কর্ম-তৎপরতার মধ্য দিয়ে। সমাজ সেই বৃহত্তর সংগঠন। সমাজ সমষ্টির প্রতিষ্ঠান, একই সঙ্গে ব্যক্তিরও, কারণ ব্যক্তির সহজ বিকাশ সমষ্টির অবাধ বিকাশের ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং প্রতিনিয়ত ব্যবহৃত সমাজসচেতন শব্দটির মধ্যে দায়চেতনাও সদাবর্তমান। এই দায়বোধ ব্যক্তির অস্তিত্বের অভীপ্সাকে ঘিরে, এবং ব্যক্তির স্বার্থেই তা সমষ্টির জীবনকে ঘিরে। জীবন অনিবার্য কারণেই দ্বন্দ্ব-সংঘাতময়। বিচিত্রভাবে খণ্ডিত একালের সমাজে এই দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ প্রখরতর ও বহুমুখী। ফলে দায়চিন্তাও একালে জটিলতর, গ্রন্থিবহুল। কবিতা যদি হয় জীবনঘনিষ্ঠ শিল্প, তবে তা' দায়চিন্তাসচেতন লক্ষ্যমুখী শিল্পও। কিন্তু সমাজের মূল কাঠামোর উপরতলের প্রস্ফুটন বলে এই লক্ষ্য অর্জনে কবিতার ভূমিকা এক পরোক্ষ বা গৌণখাতে সচল, তবে মুখ্যের সঙ্গে সম্পর্কসূত্রেই তা' গৌণ। এবং এই গৌণতা এক্ষেত্রে এমন প্রসঙ্গচ্ছিন্ন উদ্দেশ্যহীন নয় যে তা' স্বয়ংসিদ্ধ নিরপেক্ষ হয়ে স্বতন্ত্র কোনো মুখ্যতা দাবী করতে পারে। অথচ শিল্পসম্পূর্ণতাবাদ, নন্দনবাদ, শব্দকলাসর্বস্বতাবাদ, বিমূর্তবাদ, মগ্নচৈতন্যবাদ, অতীন্দ্রিয়বাদ, ইত্যাদির আশ্রয়ে সমাজ-জীবন ও পরিপার্শ্ব-সংলগ্নতা এবং নিজস্ব দায়টুকু ছিন্ন করে কবিতা এই দায়হীন মুখ্যতাও দাবী করে। এই দাবীর সূত্রেই ব্যক্ত করা হয়ে থাকে যে, ব্যক্তির কবিসত্তা বা শিল্পীসত্তার ক্রমোৎকর্ষণ, ক্রমোত্তরণ ও মুক্তির জন্য প্রতিবেশ-পারিপার্শ্বিকতা-কাল-পরিস্থিতি থেকে, সমষ্টির, এমন কি শ্রেণীর, এমন কি ব্যক্তির অস্তিত্বের প্রয়োজনকেন্দ্রিক শর্তাবলী ও দায়চিন্তার হাত থেকে তার স্বাধীনতার প্রয়োজন; কেননা শিল্পীসত্তার নিজস্ব ভুবন স্থান-কাল-পাত্রের অতীত প্রয়োজনমুক্ত এক অবিনশ্বর আনন্দময় ভুবন। কিন্তু সদাবর্তমান বিচিত্র বাস্তব অবস্থা ও পরিস্থিতিবেষ্টিত ভূমিতল পরিহার করে শূন্যতলে কর্ষণক্রিয়া সম্ভব নয়, পক্ষান্তরে সে উত্তরণ শূন্যে উত্তরণ, এবং সে স্বাধীনতা কুয়াসাবৃত শূন্যালোকে নিঃসঙ্গ উড্ডয়নের অবাধ অন্ধ স্বাধীনতা। প্রকৃতপক্ষে সুবিধাভোগবাদের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এমন ধারণা, সমষ্টির জীবনসম্পর্ক থেকে কবিকে কেবল তার ব্যক্তিসত্তাকেই বিচ্ছিন্ন করে রাখতে উৎসাহ দেয়না, স্বয়ংসিদ্ধ বলে কল্পিত এবং ব্যক্তির জীবনশর্তে বন্দী ও প্রপীড়িত বলে ভাবিত এক কবিসত্তা বা শিল্পীসত্তাকে মুক্ত করার বৃথা প্ররোচনা যোগায়। বৃথা এই অর্থে যে, কবির ব্যক্তিসত্তা ও শিল্পীসত্তা অভিন্ন ও অবিভাজ্য। ব্যক্তির সঙ্গে সমষ্টির এবং পারিপার্শ্বিক জগতের যে গভীরতম ও সুবিস্তৃত জীবনসম্পর্ক রয়েছে, সেই সম্পর্কের উষ্ণতার মধ্যেই কবিপ্রতিভা সৃজনশীল হয়ে উঠবার সুযোগ, এবং এই সৃজনক্রিয়ার মধ্য দিয়েই তার ক্রমমুক্তির জন্য সে দিগন্তহীন ভুবনের সন্ধান পায়। ভ্রান্তি-প্ররোচিত কবি ব্যক্তিসত্তা থেকে কল্পিত সেই স্বয়ংসিদ্ধ দায়নিরপেক্ষ কবিসত্তাকে মুক্ত করতে কখনো সক্ষম হন না, কেবল প্রয়াস-প্রতিজ্ঞার স্বগতঃ ভাষণে স্ফীত হন, পরন্তু এক বায়বীয় দ্বন্দ্বে শক্তিক্ষয় করেন, পরাভবচেতনায় ব্যঙ্গবাগীশ ও প্রতিক্রিয়াস্বভাবী হন, অথবা উদ্ভট অবোধ্য, বায়বীয়, কুয়াশা কল্পনাসর্বস্ব অদ্ভুত ভঙ্গিপ্রধান, শব্দ ব্যভিচারবহুল ও স্বেচ্ছাচারপীড়িত কবিতা রচনার মধ্য দিয়ে ভ্রান্ত সাফল্যের কৃত্রিম তৃপ্তিতে নিমজ্জিত থাকেন। বহুভাবে-খণ্ডিত সমাজে সুবিধাভোগী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শ্রেণী এ-সব সৃষ্টিকে চূড়ান্ত সাফল্য হিসেবে গ্রহণ করতে উৎসাহ দেয় এবং কবিতার সেই প্রাসঙ্গিক ও তাৎপর্যময় গৌণভূমিকাটিকে অকাব্যিক আখ্যা দিয়ে কবিতাকে খেয়ালসর্বস্ব, স্বেচ্ছাচারী ও অচিহ্নিত এক মুখ্য ভূমিকা পালনের দায়িত্বকে ইংগিত করে।

[দুই]

সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক সম্পর্কে বিধৃত মানবিক অভীপ্সাময় জীবন-অস্তিত্বের উপলব্ধিই কবিতার মূল উপজীব্য। উপলব্ধিকে সঙ্গত ও স্থায়ীভাবে প্রমূর্ত করে তুলতে কবিকে নতুন একটি সৃজন বা নির্মাণ ক্রিয়ায় হাত দিতে হয়। শিল্পায়ন-প্রক্রিয়া বলে বিশেষিত এই সৃজন-প্রক্রিয়ায় ঘনীভূত উপলব্ধির নির্যাসই রস। ব্যক্তিকবির এই উপলব্ধি জীবনের যতো বেশি সত্যতা, যতো গভীর আকাঙক্ষা-কল্পনা-অভীপ্সা, যতো নিবিড় আবেগ-উত্তাপঘনিষ্ঠতা, যতো বেশি স্পন্দন, গতিবেগ, ব্যাপকতা জড়িয়ে আনে, ঘনীভূত উপলব্ধির নির্যাস ততো বেশি প্রগাঢ়, উজ্জ্বল ও তীব্র হয়ে ওঠে। কবিতা এই রসের ভাষামূর্তি বলে উপলব্ধির ঘনীভবন এবং রসের প্রগাঢ়তা, উজ্জ্বলতা, তীব্রতা ও ব্যঞ্জনাপ্রাপ্তি নির্ভর করে কবিতার শব্দনির্বাচন, এবং শব্দের ব্যবহার, শব্দ-ধ্বনিসমাবেশের কৌশল ও বাকভঙ্গি-ভাষারীতির বিশেষীকরণের ওপর। এই নির্বাচন-রুচিপ্রবণতা, শব্দব্যবহার ও সমাবেশ সংক্রান্ত কৌশল, বিশেষীকৃত বাকভঙ্গি ও ভাষারীতি কবির নিজস্ব, ব্যক্তিপ্রতিভা ও স্বকল্পনা-পরিকল্পনাগত। কিন্তু ভাষার শব্দভাণ্ডারের সকল শব্দই সকলের ব্যবহারযোগ্য, নির্দিষ্ট ধ্যান-ধারণা-চিন্তাসমূহের সমাজস্বীকৃত, সাধারণীকৃত ও বহুব্যবহারে স্তিমিতপ্রভ ধ্বনিপ্রতীক। নতুনভাবে উদ্ভাসিত ও উদ্‌ঘাটিত অস্তিত্বের বিশেষ অনুভব ব্যক্তিচিত্তেই ঘটে। কিন্তু শব্দভাণ্ডারের সুনির্দিষ্ট ভাবার্থযুক্ত, সাধারণীকৃত অভিধানসিদ্ধ, ও বহুব্যবহারে বিশেষত্বহীন শব্দাবলী এবং প্রচলিত সাধারণ বাকভঙ্গি ও ভাষারীতি ব্যক্তিকবির সেই বিশিষ্ট অনুভবকে সঙ্গত রসরূপ দান করার জন্য যথেষ্ট নাও হতে পারে। ফলে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কবিকে শব্দের নির্দিষ্ট অর্থে নতুন ভাবব্যঞ্জনা চড়াতে গিয়ে শব্দের আকারে, শব্দপ্রয়োগে, শব্দসমাবেশে, শব্দের ঈপ্সিত ধ্বনিতরঙ্গ উৎক্ষেপণে কৌশলগত পরিবর্তন-রূপান্তরণ আনতে হয়। প্রযুক্ত সকল কৌশল, সাধিত সকল পরিবর্তন ও প্রদর্শিত সকল অভিনবত্ব উপলব্ধির পরিকল্পনাসিদ্ধ বাণীপ্রতিমা নির্মাণের জন্যই। কেবলি শব্দের শব্দগত প্রকারবহুল ক্রীড়াচাতুর্য, ভঙ্গির ভঙ্গিসর্বস্ব চমক-চমৎকারিত্ব, উপলব্ধির আনুগত্য স্বীকারে বিমুখ দায়হীন প্রগল্‌ভ শব্দের বারাঙ্গনাবৃত্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন কবির কাম্য নয়। কালপর্যায়ক্রমে মানুষের চিন্তা-ধারণা-জ্ঞান-উপলব্ধির বিবর্তন ঘটায় এবং সামাজিক অবস্থা ও পারিপার্শ্বিক জগতের বিভিন্ন পরিবর্তন ও রূপান্তরণের প্রেক্ষিতে নতুন জ্ঞান-চেতনা-উপলব্ধি, নতুন মূল্যবোধ, আচরণ ও রীতিনীতি প্রকাশের প্রয়োজনে বহুশব্দের পূর্বের আকার, অর্থ ও আচরণের স্বাভাবিক রূপান্তরণ ঘটে। আবার সচেতনভাবেও এই পরিবর্তন সাধন করা হয়। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই এই পরিবর্তন শব্দের পূর্বভাবার্থের প্রসঙ্গস্মৃতিসূত্র নিশ্চিহ্নভাবে ছিন্ন করে না, ভাব-ব্যঞ্জনার রূপান্তরণ ঘটায় মাত্র। একই শব্দের অর্থব্যঞ্জনার রূপান্তরণ ভিন্ন ভিন্ন কবির হাতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ঘটাই স্বাভাবিক। তবে সব ক্ষেত্রেই এই রূপান্তরণ তাৎপর্যময় ও লক্ষ্যমুখী। শব্দের ভাঙ্গা-গড়া, অর্থব্যঞ্জনার রূপান্তর-সাধন, শব্দের প্রয়োগ-সমাবেশ, বাকভঙ্গিবিন্যাস ও ভাষারীতিতে অবলম্বিত সকল কৌশল, সকল ব্যতিক্রমী নৈপুণ্য, উপলব্ধিকে প্রেরণাব্যঞ্জনাময় একটি শৈল্পিক পরিণাম দানের জন্যই। কবিতার প্রেরণা যদি হয় উদ্ভাসিত ও উদ্‌ঘাটিত অস্তিত্বের অনুভব, কবিতার রস যদি হয় সেই অনুভবেরই নির্যাস, সুকৌশলে সমাবিষ্ট কবিতার সুনিপুণ শব্দপুঞ্জ যদি হয় সেই রসনির্যাসেরই ভাবময়-সঙ্গীতময় ধ্বনিগুঞ্জরণ, এবং এই গুঞ্জরণ যদি হয় একের জাগ্রত সত্তাবোধের সঙ্গে বহুর জাগরণোন্মুখ সত্তাবোধের মিলন-সঙ্গীত, তা হলে কবিতার এবং কবিতার শব্দাবলীর মুখ্য ভূমিকায় কোনো লৌকিক-অলৌকিক অস্পষ্টতা নেই। অথচ অস্পষ্টতা ও অবোধ্যতাই কবিতার চূড়ান্ত সাফল্য, এমন ধারণার নিবিড় নৈকট্যই আমাদের অনেককে বিশুদ্ধ স্বস্তি দান করে।

আমাদের কবিতার জগৎ-ও এ-সব বোধ চিন্তা-ভাবনা, প্রশ্ন-দ্বন্দ্বশূন্য নিষ্প্রাণ জগৎ নয়। অর্থাৎ ব্যক্তি, শ্রেণী ও সমষ্টির সামাজিক অবস্থানগত, ধ্যান-ধারণা-আকাঙ্ক্ষাগত, অস্তিত্ব ও তার পরিণামগত দ্বন্দ্ব-অসঙ্গতিবোধ, জড় ও চৈতন্যের পারস্পারিক সম্পর্ক অনুধাবনের ভিত্তিতে স্থান-কাল-পাত্রসংলগ্ন বস্তুজগৎ ও মনোজগতের অনুকূল-প্রতিকূল সম্পর্ক-সংঘর্ষ থেকে উদ্ভূত পরিস্থিতি অনুধাবনের প্রয়োজনীয়তাবোধ, এবং জীবনগত ও শিল্পগত ভাব-ভাবনা-বাসনাকে ধারণাকৃত পরিস্থিতিতে সন্নিবেশ করে তারই সমগ্রতায় জীবন-অস্তিত্ব ও তার অভীপ্সার স্বরূপকে অবলোকন করার প্রবণতা আমাদের কবিদের কবি-ভাবনাতে অন্তর্লীন রয়েছে। এই বোধ, অনুমান ও প্রবণতা, অবশ্যই ব্যতিক্রমসহ, সাধারণতঃ ঐতিহ্যিকতায় মসৃণ, এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে এগুলির মৌলিক চরিত্রের পরিবর্তন বা রূপান্তরণ না ঘটলেও, সামাজিক পরিস্থিতি ও ঘটনাসমূহের তীব্রতাবৃদ্ধির মাত্রাভেদে এগুলি চাঞ্চল্যে ও সক্রিয়তায় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং কবিতায় রক্তসঞ্চার সম্ভাবিত হয়। সামাজিক পরিবর্তন সংঘটনের মূল শক্তিকেন্দ্রে কবিতার ভূমিকা গৌণ। আমাদের সমাজে পরস্পরবিরুদ্ধ শক্তিসমূহের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ অব্যহত থাকলেও সামাজিক কাঠামোর ভেতর-গঠন বিন্যাস ক্ষয়িষ্ণুতা নিয়েই প্রবলতর শ্রেণীর সতর্ক রক্ষণাবেক্ষণ-তৎপরতায় তার আয়ুকে প্রলম্বিত করে রাখতে পারায় উপরতলবর্তী এই গৌণ ভূমিকায় অবতীর্ণ কবিকুল তাঁদের বোধ-উপলব্ধি-চেতনাকে রক্ষণ-লালিত মূল্যবোধের আপাতঃ নিরাপদসংলগ্নতায় ন্যস্ত করে কাব্যিক শিল্পকলাকৃতিত্বে উত্তীর্ণ হবার প্রয়োজনকেই অধিক গুরুত্বদানের পক্ষপাতী। পক্ষান্তরে এমন সংলগ্নতাবিরোধী ও বিকল্পবোধে প্রাণিত কবি-সম্প্রদায় তাঁদের তীব্র জীবন সচেতনার শিল্পায়নমনস্কতাকে অধিক গুরুত্ব দান না করায় তাঁদের প্রতিশ্রুতিশীল শিল্পী-প্রতিভা ক্রমাগত সম্ভাবনাবদ্ধ হয়েই থাকছে। তবু, আমাদের কবিতার বিকাশের সীমাবদ্ধতা ও সম্ভাবনা, তার সামগ্রিক প্রাণবন্ততা ও আড়ষ্টতার স্বরূপ ও পরিমাণ গভীরতর বিশ্লেষণের অপেক্ষায় থাকলেও স্বীকার্য যে, জীবন-অস্তিত্বের শর্তাবলীস্পর্শিত সতর্ক মননশীলতা ও দায়চিন্তাও চারদশক ধরেই আমাদের কবিতার গভীরে জাগ্রত আছে, এবং সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ-পরিস্থিতির ও বিবর্তন-পরিবর্তনের গুণগত ও পরিমাণগত মাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধিভেদে তার তীব্রতা-তীক্ষ্ণতার হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। স্তরপর্যায়ক্রমে এ-ভাবে কবিদের হাতে শিল্পসুন্দর এমন সব কবিতার জন্ম হয়েছে যে-গুলিতে সমাজ-জীবনের হৃৎস্পন্দন, রক্তসঞ্চালনের স্বরূপ ও আকাঙ্ক্ষার উত্তাপ অনুভব করা যায়। বস্তুতঃ নন্দনবাদ, শিল্পসর্বস্বতাবাদ, মগ্নচৈতন্যবাদ, বিমূর্তবাদ, বিশুদ্ধতাবাদ এমন আরো কতো সব মহৎ তত্ত্বের আশ্রয়েই কবি-প্রতিভার বিকাশ ঘটে এবং ঘটছে বলে যতোই দাবী করা হোক না কেন, প্রকৃত সত্য এই যে, প্রায় চার যুগ ধরে রচিত বাংলাদেশের কবিদের সুন্দরতর ও মহত্তর কবিতাগুলো স্থান-কাল ও সমাজ-সম্পর্কে বিধৃত জীবন-অস্তিত্বের সেই মহৎ অভীপ্সার বৃন্তেই মাত্র প্রস্ফুটিত হতে পেরেছে। কবিরা যখনই ঐতিহাসিক, সামাজিক ও ভৌগোলিক প্রেক্ষিত-চেতনার সঙ্গে বর্তমান ব্যক্তিজীবন-চেতনাকে অভিন্ন রেখে জীবনের কোনো নিগূঢ় সত্য, কোনো গভীরতর স্বাদ, কোনো মহৎ উৎকণ্ঠা আবিষ্কার ও অনুভবের প্রয়াস পেয়েছেন, কবিতায় তখনই নতুন রক্তসঞ্চার আসন্ন হয়ে উঠেছে। বাংলাদেশের চার দশকের ইতিহাস নিরন্তন অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতার, এবং এগুলো থেকে ক্রমমুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস। নবীন-প্রবীণ সকল কবিকেই সমাজে তাঁদের বিশেষ অবস্থানের প্রেক্ষিতে এই বহুমুখী দ্বন্দ্বে-নিক্ষিপ্ত জীবনের ভাবনায় কোনো-না-কোনো ভাবে প্রতিনিয়ত আন্দোলিত হতে হয়েছে, এবং তাঁদের কবিতায় সে দ্বন্দ্ব, অস্থিরতা, বিমূঢ়তা, যন্ত্রণা, ও এগুলো থেকে, বাঞ্ছিত-অবাঞ্ছিত যে-কোনো পথেই হোক, উদ্ধার-ভাবনা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। অর্থাৎ সামাজিক ইতিহাসের কালগত অমোঘতা জীবন-উদাসীন ও দায়ছিন্ন,

আত্মসর্বস্ব স্বেচ্ছাচারী কবিকল্পনার শুষ্ক স্ফূর্তিকে শর্তহীন আনুকূল্যদান তো করেই নি, বরং কবিদেরকে দিয়ে প্রকাশ্যে-গোপনে সে তার নিজস্ব প্রয়োজনকে সিদ্ধ করে নিতেই চেয়েছে।

[দুই]

জীবনের প্রতি আসক্তি জীবচরিত্রের প্রধান লক্ষণ। মানুষই কেবল এই আসক্তিকে সুন্দরভাবে প্রকাশ ও মহৎভাবে ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে। এই আসক্তি জীবনের ক্রমপ্রসারণসম্ভব গণ্ডীর মধ্যে যা-কিছু সুন্দর, যা-কিছু কল্যাণকর, অর্থাৎ যা-কিছু তার অস্তিত্বের অনুকূল, তাকে উপভোগ-অনুভব ও কল্পনা করার। মানুষ উপভোগের এবং উপভোগকল্পনার বস্তুগত ও ভাবগত উপাদানের সন্ধান পেয়েছে মানুষের ভেতরে, প্রকৃতির ভেতরে এবং মানুষ হিসেবে তার নিজের ভেতরে। জীবন-উপভোগের আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্তি ও পূর্ণতাদানের জন্যে, তাকে গভীর, বিস্তৃত, গতিময় ও মহৎ করে তুলবার জন্যে সে অস্তিত্বকে রক্ষা ও প্রলম্বিত করতে গিয়ে জ্ঞান-বুদ্ধি-মনন এবং আবেগ-স্মৃতি-কল্পনাচর্চার আশ্রয় গ্রহণ করতে শিখেছে। জীবনের প্রতি তার আসক্তি যতো প্রবলই হোক, মানুষের মধ্যে, প্রকৃতির মধ্যে এবং তার নিজের মধ্যে জীবনোপভোগের অনিঃশেষিত যতো বিচিত্র উপাদানই সে আবিষ্কার করুক, জীবন অস্তিত্বের অবক্ষিম দৈর্ঘ্যকে সে যতোই কামনা করুক, অভিজ্ঞতায় সে জেনেছে, বিশ্বসৃষ্টির বিশালত্বের তুলনায় সে অতি ক্ষুদ্র, জীবনের দৈর্ঘ্য সীমিত; অধিকন্তু তার অফুরন্ত আনন্দের উৎস মানুষ, প্রকৃতি ও সে নিজে, এই তিনের মধ্যেই সে আবিষ্কার করেছে তার দুঃখ, তার অস্তিত্বের সকল প্রতিকূলতার উৎসকে। জীবনের সীমাবদ্ধতা, প্রতিকূলতা, ব্যর্থতা ও অসহায়ত্বকে সাধ্যমতো জয় করে জীবন-পিপাসাকে চরিতার্থ করতে হলে, জীবনের সচ্ছন্দ গতিকে অব্যহত রাখতে হলে, সমষ্টির অস্তিত্বের অনুকূল জীবনমূল্যবোধসমূহের ভিত্তিতে মানুষকে সমাজবদ্ধ হতে হয়, এই তিনকে নিবিড় নৈকট্যে অবস্থান গ্রহণ করতে হয়। এই নিবিড় নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের উষ্ণতা তাকে কর্মে ও জীবনসংগ্রামে শক্তি দান করে এবং জীবন তৃষ্ণার সামনে আনন্দের সকল উৎসকে অনাবৃত করে দেয়। ব্যক্তি-ভেদ, গোষ্ঠীভেদ, সম্প্রদায়ভেদ ও শ্রেণীভেদ সমষ্টির পারস্পারিক প্রত্যাশিত সেই সুসম্পর্কের মধ্যে অসংখ্য ফাটল ও শূন্যতা সৃষ্টি করে এবং মানুষের মনে নিঃসঙ্গতা, বিষণ্ণতা ও অসহায়ত্ববোধের জন্ম দেয়। আধুনিক পৃথিবীতে দ্রুতবর্ধমান এই শূন্যতা মানুষের মধ্যে মানুষের দূরত্ব ও অপরিচয়ের ব্যবধানকে প্রায় চূড়ান্ত করে এনেছে। সুবিধাভোগী ও সুবিধাবাদী প্রবল শ্রেণীগুলো নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্যে এইসব বিচ্ছিন্নতা, নিঃসঙ্গতা ও শূন্যতা, এবং এসবের সহজ পরিণাম দুঃখ, হতাশা, জীবনবিমুখতাকে ঢেকে রাখার উদ্দেশ্যে তাদের ওপর অলৌকিক, বায়বীয় ও শব্দচাতুর্যে জটিল সব উদ্ভট উদ্ভট দার্শনিক ব্যাখ্যা-ব্যঞ্জনা আরোপ করে মানুষকে পূর্ণ ললাটবাদী করে তুলছে। এ-সব দর্শনের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যিক আভিজাত্যও আছে, এবং সে আভিজাত্য শ্রেণী-আভিজাত্যের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের সঙ্গেই জড়িত।

এই নিঃসঙ্গ একাকীত্বের যন্ত্রণার সুর আমাদের কবিতায় সুস্পষ্ট ধ্বনিত হয়েছে। এ-সুর ব্যক্তির কান্না ও বিলাপের, কারণ ব্যক্তি সমষ্টি থেকে, তার পারিপার্শ্বিক প্রকৃতিজগৎ থেকে, কাল থেকে বিচ্ছিন্ন। এবং কবির একাকীত্বের যন্ত্রণা একান্তই কবির একার, কারণ তিনি বিচ্ছিন্নতার দেয়ালঘেরা কারাগারে বন্দী, যন্ত্রণার অংশীদার নেই তাঁর :

১. ‘ডাকলে কেউ আসেনা, যাবার মত কেউ নেই, এই
একাকী নিঃসঙ্গ আমি একলা বাতাসের বুকে উথালপাথাল
এই ভয়াবহ শূন্যতার বুকে আমি কেবল কান্নায় ভেঙে
ঝুলে থাকবো আর কতকাল।’[১]

২. ‘ভালোবাসা ভালোবাসা বলে আমি গেলুম এগিয়ে
তাকে কোথাও দেখিনা। আমি
যতই সামনের দিকে চলে যাই
একে একে সব
সঙ্গীরা হারিয়ে যায় একা পড়ে থাকি।’[২]

৩. ‘এখন তুমি নিঃসঙ্গ নিঃসঙ্গ বলে
বাতাসে হাহাকার তোলো।
সরে যেতে যেতে তুমি নিঃসঙ্গ
এখন তুমি ফিরে আসবার কথা ভাবোনা।’[৩]

৪. ‘নিঃসঙ্গতা আমার একার। এই
মরা ফুল বিধ্বস্ত খামার
আমার একার।’[৪]

৫. ‘আসমানের তারা সাক্ষী
সাক্ষী এই জমিনের ফুল, এই
নিশিরাইত বাঁশবাগান বিস্তর জোনাকি সাক্ষী
সাক্ষী এই জারুল জামরুল, সাক্ষী
পূবের পুকুর, তার ঝাকড়া ডুমুরের ডালে স্থিরদৃষ্টি
মাছরাঙা আমাকে চেনে
আমি কোনো অভ্যাগত নই
খোদার কসম আমি ভিনদেশী পথিক নই
আমি কোনো আগন্তুক নই।’[৫]

৬. ‘এখন নিঃসঙ্গ আমি, পরিপার্শ্ব কর্কশ বিমুখ, উপরন্ত
অত্যন্ত বিরল বন্ধু। বুঝি তাই হৃদয়ের তন্ত
কেমন বেসুরো বাজে।’[৬]

৭. ‘যেদিকে বাড়াই হাত
সেদিকেই নামে ধ্বস, প্রসারিত হাতগুলো তলহীন গহ্বরে হারায়
আর আমি নিজে যেন পৌরাণিক জন্তুর বিশাল
পিঠের ওপর একা রয়েছি দাঁড়িয়ে;’[৭]

৮. ‘সমস্ত শহর আমি স্যাণ্ডেলের আঘাতে আঘাতে
বিক্ষত করছি শুধু, হাঁটছি, হাঁটছি সঙ্গীহীন।’[৮]

৯. ‘বিয়াবান ময়দানে একাকিনী শাখাতরু
খরখরে উদাস মাটি আদিগন্ত তাকে ঘিরে! অকাতরে
পাতা ঝরে, হয়তো বা শেষ পাতা ধূলোর ধূসরে।
তবুও তাকেও নাকি রাত্রি দেয় কোল, চন্দ্রিমা
চাঁদনীর আহ্লাদে খিলখিল হাসে
সহবাসে। সঙ্গী ছিল যারা, দেউলিয়া
মাটি ঝেটিয়ে করেছে দূর, বিষণ্ন বিরস
নিঃসঙ্গতায় ধুধু করা মাঠে তবু তার সূর্য ওঠে,
মায়াবিনী অঙ্ক মেলে রাত।’[৯]

১০. 'মসজিদে আজানের আর্তস্বর
আত্মাকে চিরে চিরে
মোয়াজ্জিন বুঝি হাঁকে?
ডাকে নাকি আর কাউকে সে
নিঃসঙ্গ প্রার্থনার সমাবেশে,
ভয়ে আর্তনাদে? নাকি শুধুই
একাকী আত্মার কান্না ছোঁড়ে সে
বারবার আকাশ সীমায়?'[১০]

১১. 'অথচ চেনেনা কেউ, জানেনা কি নাম, পেশা, কোথায় নিবাস,
এখানে এসেছি কেন, কাকে চাই, যাবো কোন গাঁয়।'[১১]

১২. 'আমি সারা শহর একজন সুহৃদ খুঁজে বেড়াচ্ছি,
এখন আমার একজন বন্ধু দরকার,
আমার সমস্ত চেতনায় একটি কড়া নাড়ার আগ্রহ
একজন বন্ধুর মুখ দেখার বাসনা,
একটি স্বরচিত কবিতা শোনানোর নির্লজ্জতা
রক্তের শব্দের মতো বইতে লাগলো।
আমার একাকী আত্মার পেরেক বিদ্ধ ছিদ্র পথে
রক্তবমির মতো উগড়ে উঠলো একটি হিব্রু আর্তনাদ
'এলী, এলী, লামা সবক্তানী'।
আমার সমস্ত গন্তব্যে একটি একটি তালা ঝুলছে।'[১২]

১৩. 'এই যন্ত্রণার তিক্ত শেল রিক্ত শাখা শলাকা উদ্ধত
নিত্য বেঁধে একাকী আমাকে। আমি
তাকে আর পারিনা জাগাতে। শুধু
যন্ত্রণায় জেগে থাকি হিম রক্ত অন্ধকারে।'[১৩]
১৪. 'এই মতো জীবনের সাথে চলে কানামাছি খেলা
এবং আমাকে নিষ্কপর্দক, নিষ্ক্রিয়, নঞর্থক
করে রাখে; পৃথিবীতে নিঃশব্দে ঘনায় কালবেলা!
আর আমি শুধু আঁধার নিঃসঙ্গ ফ্ল্যাটে রক্তাক্ত জবার মতো
বিপদ-সংকেত জেলে একজোড়া মূল্যহীন চোখে
পড়ে আছি মাঝরাতে কম্পমান কম্পাসের মতো
অনিদ্রায়।'[১৪]
১৫. 'মানুষের কাছ থেকে সরে যাচ্ছে
প্রত্যেক মানুষ
এখন মানুষ শুধু খণ্ড খণ্ড বিচ্ছিন্ন একক।'[১৫]
১৬. 'শহরের কাছের শহর
নতুন নির্মিত একটি সাঁকোর সামনে দেখলুম তীর তীর করছে জল,
আমাদের সবার মুখ সেখানে প্রতিফলিত হলো,
হঠাৎ জলের নীচে পরস্পর আমরা দেখলুম
আমাদের পরস্পরের প্রতি পরস্পরের অপরিসীম ঘৃণা ও বিদ্বেষ!
আমরা হঠাৎ কী রকম অসহায় আর একা হয়ে গেলাম!

আমাদের আর পিকনিকে যাওয়া হলো না,
লোকালয়ের কয়েকটি মানুষ আমরা
কেউই আর আমাদের এই ভয়াবহ নিঃসঙ্গতা একাকীত্ব, অসহায়বোধ
আর মৃত্যুবোধ নিয়ে বনভূমির কাছে যেতে সাহস পেলাম না!'[১৬]

১৭. 'কৈশোরেই ধ্বসে গেলো সমস্ত পৃথিবী, বদলে গেল প্রকৃতির রূপ,
ভূমিকম্পে উবে গেল পিতৃঋণ ভিটে, জলোচ্ছ্বাসে
মুছে গেলে ভৌগোলিক রেখা
নিজেকে বিচ্ছিন্ন বলে অবশ্যই করেছি ঘোষণা,
যেন কোন
দুঃশীল কালের জলে সারা দেশ হয়েছে সাগর,
আমি তার বুকে
নিঃসঙ্গ দ্বীপের নামে টিকে আছি সুপ্রাচীন বঙ্গ জনপদ।'[১৭]

সমষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির একাকীত্বের হাহাকার কবিতার এ-সব উদ্ধৃতিতে সুস্পষ্ট। নিঃসঙ্গতাবোধ যেন অস্তিত্বচেতনারই অপর পিঠ। অথবা অস্তিত্ব মানেই যেন নিঃসঙ্গতা। সমগ্রতায়, যেন একটি শূন্যতা। ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন ব্যক্তি থেকে, কাল থেকে, স্থান থেকে, তার পরিপার্শ্ব থেকে। যে মানুষ, যে সময়, যে বস্তুময় ও ভাবময় পরিমণ্ডল, যে নিসর্গ এবং যে উষ্ণতাহীন যান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্ক তাকে প্রতিনিয়ত ঘিরে আছে, সে সবই তার অস্তিত্বের প্রতিকূল, সুতরাং আনন্দহীন,—মরা ফুল, বিধ্বস্ত খামার, কর্কশ বিমুখ পরিপার্শ্ব, বন্ধুর বিরলতা, সমস্ত গন্তব্যে তালাবদ্ধ দরোজা, তলহীন গহ্বরে হারিয়ে যাওয়া প্রসারিত হাত, দেউলিয়া মাটি, ভয়াবহ শূন্যতায় উথালপাথাল বাতাসের বুক, কান্নায় ভেঙে ঝুলে থাকা অন্তহীন কাল,—এই সব। এবং এই ভয়াবহ একাকীত্বের সকল অনুভূতি, অনুর্বর প্রান্তরে পত্রহীন-পুষ্পহীন একটি নিঃসঙ্গ শুষ্ক বৃক্ষের প্রতীকে সম্পূর্ণতা পেয়ে হাহাকার করে ওঠে, অথবা নিঃসঙ্গ ফ্ল্যাটে সমগ্র চৈতন্যে রক্তজবার মতো বিপদ-সঙ্কেত জ্বেলে সারারাত কম্পাসের মতো অনিদ্রায় কম্পমান থাকে, অথবা, ভেতরে ফাঁপা সম্পর্কে পরস্পর বিচ্ছিন্ন অথচ বাইরের যান্ত্রিক উল্লাসে যূথবদ্ধ নাগরিক যুবদলের ভয়াবহ আত্মসচেতনতায় পিকনিক যাত্রার মাঝপথ থেকেই নিষ্প্রাণ নগরে প্রত্যাবর্তনের কাহিনীতে দীর্ঘশ্বসিত হয়ে ওঠে। চূড়ান্ত বিচ্ছিন্নতাবাদে আক্রান্ত সমাজের চৌচির ভূমিতলে দাঁড়িয়ে আনন্দ-সৌন্দর্য-প্রেমে নিবেদিতপ্রাণ কবিকেও যথার্থই বলতে হয়, 'অথচ চেনেনা কেউ, জানেনা কি নাম, পেশা, কোথায় নিবাস, এখানে এসেছি কেন, কাকে চাই, যাবো কোন গাঁয়ে'। এবং অপরিচয়ের, অনাত্মীয়তার ব্যবধান কতো মর্মান্তিকভাবে সম্পূর্ণ হলে চিৎকারে গলায় রক্ত তুলে অসহায়ের মতো বলতে হয়, 'খোদার কসম আমি ভিনদেশী পথিক নই, আমি কোনো আগন্তুক নই'। খণ্ডিত অস্তিত্বের যন্ত্রণা এ-ভাবে অন্যতম কবি-প্রেরণায় পরিণত। এই যন্ত্রণার বৃন্তমূলে মুকুলিত কবিতা তখনই পূর্ণতায় বিকশিত হয়ে ওঠে যখন তা' একান্তই ব্যক্তিচিত্তের নিভৃত বেদনাবিলাসে কুঁকড়ে না গিয়ে, ব্যক্তি, সমষ্টি ও প্রকৃতি, এই তিনের সমগ্রতার মধ্যে দল-পাপড়ি মেলতে চেষ্টা করে। স্থান, কাল ও পরিস্থিতির ব্যবধানে প্রিয় ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ, প্রিয় প্রতিবেশ, বা অন্তরঙ্গ কাল-মুহূর্ত-সমূহের সঙ্গে যে বিচ্ছেদ, যা' মানব জীবনের সচল প্রবাহের অনিবার্য ঘটনা, এবং যা' আবহমান কালের কাব্যে-সঙ্গীতে ও অধ্যাত্মদর্শনে বিরহ-মহাবিরহ নামে নন্দিত, তার মতো শ্রেণীসভ্যতা, আধুনিক মহাযন্ত্রশিল্প ও বণিকসভ্যতার অন্যতম অস্ত্র শতখণ্ডতা-বাদের ফসল এই বিচ্ছেদ-যন্ত্রণাবোধও আধুনিক সমাজসচেতন কবিতার একটি স্থায়ী অনুষঙ্গে-প্রসঙ্গে পরিণত।

কবিতায় নিঃসঙ্গতাকে কখনো কখনো অনুষঙ্গ-প্রসঙ্গের গৌণতা থেকে আলাদা করে তাকে অস্তিত্বময় এক বিষয়ব্যঞ্জনায় অনুভব করতে চেষ্টা করা হয়েছে, এবং সর্বগ্রাসী কবি-ক্ষুধা তাকে নিঃশেষে শোষণ করে নিতে চেয়েছে :

'যখন বাড়ায় ঠোঁট নিঃসঙ্গতা, আমিও চুম্বন
করি তাকে, নিই শুষে অবিরাম অস্তিত্বের রুক্ষ
প্রান্তরের প্রতিধ্বনিগুলি।'[১৮]

কিন্তু ব্যক্তিকবির, কিংবা কবিতার, সব কিছুকে শোষণ বা আত্মস্থ করে নেবার ক্ষমতা অপূর্বভাবে প্রমাণিত হলেও নীলকণ্ঠ শিবের মতো এই নিঃসঙ্গতার যন্ত্রণা একাকী কণ্ঠে ধারণ করে রাখা সম্ভব নয়, কারণ এ বিষ সামাজিক অভিশাপ বিশেষ, এবং এর উৎপাদন ও সরবরাহ সুনিশ্চিত রাখার জন্য তেল-বিদ্যুৎ-সৌরশক্তি-চালিত সমুদ্রমন্থনদণ্ডের কর্কশ ঘূর্ণন অব্যহত আছে। তবু ব্যক্তির এবং সমষ্টির সামাজিক অস্তিত্বের বিপন্নতা কবিদেরকে নীলকণ্ঠ করতে না পারলেও, উদ্‌ঘাটিত অস্তিত্বের গরল-নির্যাস তাঁদের কণ্ঠকে নীল করে রেখেছে। এবং শিবত্বপ্রাপ্তি অসম্ভব হলেও কোনো কবি অস্তিত্ব-চেতনাকে আদিগন্ত খরখরে অনুর্বর প্রান্তর-পরিবৃত এক নিঃসঙ্গ শুষ্কতরুর প্রতীকে খাড়া করে যখন বলেন,

'তবুও তাকেও নাকি রাত্রি দেয় কোল, চন্দ্রিমা,
চাঁদনীর আহ্লাদে খিলখিল হাসে সহবাসে,'

তখন সান্ত্বনাদানের ছলে তিনি প্রেতলোকের অট্টহাসির ভয়াবহতাকেই উচ্চকিত করে তোলেন। পক্ষান্তরে, বহুশতাব্দী খ্যাত আত্মসর্বস্বতাবাদী তাত্ত্বিকেরা যে অভিজাত নিঃসঙ্গতাবোধ নামক সংস্কারের জন্ম দিয়েছেন এবং মনুষ্য জন্মের মধ্যেই যার বীজ উপ্ত রয়েছে বলে মানুষের সহজাত স্বকীয় স্বভাব কিংবা স্বকীয় স্তব্ধতারূপে তাকে বিবেচনা করতে বলেছেন, যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তির জন্য সেই সনাতন গুহ্য আশ্রয়ে কবিদের নিরাপত্তা অন্বেষণের আকাঙ্ক্ষাও কবিতায় অব্যক্ত থাকেনি :

'বস্তুত তাদেরই একজন আমি যারা মধ্যরাতে
অভ্যাসবশতঃ
একাকী ঘুমন্ত হাঁটে বারান্দায়, ছাদের কিনারে
ভীষণ বিপজ্জনকভাবে চলে গিয়েও আবার ফিরে আসে
স্বকীয় নিঃসঙ্গতায়।'[১৯]

'পারিনা বলতে কিছু, যেন ভুলে গেছি মাতৃভাষা। নেরুদার
সেই জলকন্যার মতন
অকস্মাৎ ফিরে আসি স্বকীয় নৈঃসঙ্গ্যে'[২০]

'হয়তো বুঝিনা এই ছলাকলা আমরা, কারণ
আমাদের স্তব্ধতায় আমরা যে ভয়ানক একা।'[২১]

[তিন]

সমষ্টি-মানুষ এবং প্রকৃতি-জগৎ থেকেই কেবল ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন নয়, নিজের ভেতর-বাইরেটাও তার চূর্ণিত। কবির কাছে তাঁর চারপাশের মানুষ অপরিচিত, অনাত্মীয়, উদাসীন

এমন কি বিরুদ্ধ; চারপাশের মানুষের কাছেও তিনি অপরিচিত আগন্তুক, বিদেশী যেন। উভয়ে উভয়ের প্রতি অনুরাগহীন, করুণাহীন, সহানুভূতিহীন, আগ্রহ ও আনুকূল্য-বিমুখ। আনন্দ ও সান্ত্বনার উৎস প্রকৃতিও প্রতিকূলতায় রূপান্তরিত। আদিম উদার সমুদ্র-আকাশ, অরণ্য-পর্বতমালা, নদী-শস্যক্ষেত, ফুল-পাখি, চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ অপহৃত, তাদের ওপর শ্রেণী-উপশ্রেণী ও পরাশক্তিসমূহের অবৈধ মালিকানা ও নির্লজ্জ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত,—

‘এই তো তোমার শহর, তোমার স্ব-হর সমাবেশ—
মানুষের পর মানুষ
অথচ খাদ্য ও খাদক
বস্তগ্রাস ও বস্তি
ভিখিরি ও বেশ্যা
—পাশাপাশি
অপহৃত অরণ্য, সমুদ্র ও পর্বতের প্রতি
হাজার হাজার বছর ধরে
এই এক অভিন্ন মিছিলে দাঁড়িয়ে আছে
আশা-আকাঙ্ক্ষাহীন আকাশ আবৃত গাছের মতো—’।[২২]

সমুদ্র, আকাশ, অরণ্য, পর্বত, মরুভূমি, তুষার মেরু ও সুশান্ত দ্বীপদেশের অতল নির্জনতা ও গভীরতা লোকালয়-জনপদকে শোষণ ও ধ্বংস-তৎপরতার নিরাপদ ঘাঁটি। কবিমনে তাই কেবল, তবু ওঠে চাঁদ, তবু ফোটে ফুল, তবু গায় পাখি, সমুদ্র শোনায় তবু রূপকথা, আকাশ পাঠায় স্বর্গশিশির, এমন সব আত্মপ্রবোধমূলক অসহায় সান্ত্বনা-গুঞ্জরণ। ব্যক্তি নিজেও স্থানচ্যুত, কালচ্যুত, স্বভাবচ্যুত, নিজেই নিজের অস্তিত্ব বিরোধী। তার শৈশব-কৈশোর অকাল যৌবনে, যৌবন অকাল বার্ধক্যে খণ্ডিত, তার সকল বয়স আয়ু, ভূগোল ও স্বপ্ন থেকে বিচ্ছিন্ন। কবিতায় তাই দ্রুতকুঞ্চিত কৈশোরের জন্য যৌবনের কান্না, বিক্ষত-নিহত যৌবনের জন্য প্রৌঢ়ত্বের কান্না স্মৃতিমথিত প্রগাঢ় বিষণ্নতায় প্রতিধ্বনিত:

১. ‘এখন ছেলেটি
সারাদিন ভয়ের ভাবনার
পথে হেঁটে;
এখানে-ওখানে হাত পেতে
মিনতি জানায়:
গান নাও
সুর নাও
ফুল পাখি চাঁদ নাও
সমস্ত ভোরের সোনা এই নাও।
শুধু দাও—
একটু নির্ভর
আর
একটু ভরসা দাও মনে;
এই আশ্বাস দাও বেঁচে থাকবার
মাথা রাখবার ঠাঁই দাও।

সারাদিন পথে হেঁটে হেঁটে
সারাদিন মিনতি জানিয়ে

শুধু তার মিনতির
প্রতিধ্বনি কুড়িয়ে কুড়িয়ে
দিন গেলে ;
কখন পথের পাশে ঘুমায় ছেলেটি।
পাশে তার
'তিরিশ বছর কাল'
ক্লান্ত হয়ে ঘুমায় এখন।
কিশোর চোখের সেই দৃষ্টির লাবণি
অসহ্য ঘুমের স্রোতে
ভেসে যায়।'[২৩]

২. 'স্মৃতির জানালা খুলে একে একে চেয়ে দেখি সব,—
মায়াবী হিজল ফুলে মালা-গাঁথা সোনার শৈশব,
বকুলের স্নিগ্ধ ঘ্রাণে একাকার সেই ছেলেবেলা
এখনো শিশির-ভেজা সকালের ঘাসে করে খেলা।'[২৪]

৩. 'ঝাঁক ঝাঁক পাখির পাখা ঝলসানির মতো হাসি
ভালোবাসতে তুমি। রঙ-বেরঙের পাখি ভালোবাসতে শিখেছিলে
অনেক আগেই। দেখেছি কতদিন ওদের নানা নাম ধরে
ডেকে ডেকে হারিয়ে গেছ ডাগর জ্যোৎস্নায়।
পাখির ঝাঁকের পেছনে ছুটতে ছুটতে ডাগর জ্যোৎস্নার
হারিয়ে-যাওয়া কিশোর,
প্রাণপণে তোমাকে ডাকি, তুমি সাড়া দিলেনা।'[২৫]

৪. 'যুদ্ধবাজ সাইরেনে উচচকিত কৈশোর আমার
গলির বিধ্বস্ত ঘরে। গুলির শব্দের প্রতীক্ষায়
কেটেছে ভূতুড়ে রাত্রি অন্ধকারে এবং তামার
মতো দিন খাকির প্রতাপে কাঁপে শান্তির ভিক্ষায়।

যৌবন দুর্ভিক্ষ-বিদ্ধ, দাঙ্গাহাঙ্গামায় ভাঙে দেশ,
এদিকে নেতার কণ্ঠে নির্ভেজাল স্বদেশী আকুতি
ভাষা খোঁজে। আদর্শের ভরাডুবি, মহাযুদ্ধ শেষ,
মঞ্চ তৈরী : কে হবে নায়ক তবে? করি কার স্তুতি?

সগৌরবে ঢাক-ঢোল বাজালো সে ধ্বংসের উৎসবে
যারা তারা কেউ পেলো শিরোপা, কেউবা পতনের
ঝাঁ-ঝাঁ স্মৃতি ; বহু মাঠ গেলো ভ'রে নামহীন শবে।
পচা মাংস দেখে দেখে ক্লান্ত হয়ে বেশ্যার স্তনের

উষ্ণতায় মনস্তাপ মাখে যে-লোকটা, মগজেই
ঘোরে তার শবাধার, একগাছি দড়ি কিংবা ক্ষুর—
যা-কিছু হননপ্রিয়, যা-কিছু অত্যন্ত সহজেই
জীবনকে করে তোলে অর্থহীন জীর্ণ আঁস্তাকুড়।'[২৬]

৫. ‘আমি কারো মুখে আর দেখি না চোখ,
দীপ্ত আঁখি পটলচেরা, জীবনের ছায়া ছলছল
নিষ্পাপ সরল উদ্‌গ্রীব
শিহরিত আনন্দিত স্পন্দিত
ব্যথাসুখ নন্দিত
ভায়ের মায়ের দুই চোখ, প্রতিবেশী দুই চোখ
আত্মার ঘনিষ্ঠ দুই চোখ
আমি আর দেখতে পাইনে
শুধু ত্রাসের গহ্বরে দেখি ডুবে গেছে
গাছপালা আকাশ নদী শিশু
শৈশব কৈশোর যৌবন’[২৭]

৬. ‘বুড়ো লোকটার লোলিত জিহ্বায়
চুকচুক আওয়াজ উঠছে জীবনের শেষ ঘণ্টাধ্বনির।
অ্যালবামে বাঁধা পড়ে আছে ক্রমান্বিত অতীত,
ফিরে তাকালে যৌবন ব্যঙ্গ করে, কৈশোর মুখ ফেরায়।’…

‘তার চোখে মৃত শিরার দাগ, ব্যর্থতার অমোঘ অক্ষর
দগদগে আগুন জ্বালিয়ে স্বপ্ন দিয়েছে পুড়িয়ে।
স্বপ্ন কি সে কখনো দেখেছিল? সে বলতে পারবে না।
বুড়ো লোকটা কিছুই বলতে পারবে না। কেননা তার
জীবনটা ছিল কানামাছি খেলা। কেউ দুহাত দিয়ে
আজীবন তার দৃষ্টির ওপরে স্থূল পিচ্ছিল এক ছায়া
রেখেছিল ঝুলিয়ে। এই কি আমারও পরিণাম?’[২৮]

৭. ‘যন্ত্রণাকে চূর্ণ করো যন্ত্রণার শেলে;
কখনো যুবক ছিলে——এ দুর্ভাবনাকে যাও ভুলে, ভাগাড়ে কি
যৌবন কখনো তার সবুজাভা রাখে?
হৃদয় হত্যার পর
ভাগাড়ের শূন্য হাড়ে, দাঁড়কাক, বৃথা খোঁজো শিশুদের মুখ।’[২৯]

৮. ‘কবিতা তো কৈশোরের স্মৃতি। সে তো ভেসে ওঠা ম্লান
আমার মায়ের মুখ; নিম ডালে বসে থাকা হলুদ পাখিটি
পাতার আগুন ঘিরে রাতজাগা ছোটো ভাইবোন
আব্বার ফিরে আসা, সাইকেলে ঘণ্টাধ্বনি-রাবেয়া-রাবেয়া—’…

‘কবিতা তো ছেচল্লিশে বেড়ে ওঠা অসুখী কিশোর
ইস্কুল পালানো সভা, স্বাধীনতা, মিছিল, নিশান
চতুর্দিকে হতবাক দাঙ্গার আগুনে
নিঃস্ব হয়ে ফিরে আসা অগ্রজের কাতর বর্ণনা।’[৩০]

৯. ‘সময়ের দাঁতে ক্ষয়ে যায় যৌবন
তিরিশেই পালে ফাটলের কালো রেখা
কোথায় ভেড়াবো কম্পিত কল্লোলে
শঙ্কিত তরী, বঞ্চিত জাগি একা।’[৩১]

১০. 'পালিয়ে-আসা গ্রামে কোনোদিন ফেরা হবে না আর…'
'সাত-দিন সাত-রাত নৌকোয় নৌকোয় পার হ'য়ে
মূল ভূখণ্ড তুমি হারিয়ে ফেলেছো চিরতরে
চি-র-ত-রে
মূল ভূখণ্ড তুমি হারিয়ে ফেলেছো
তবু শিকড়ের টান তোমাকে বানিয়েছে কবি
তোমার জন্মগ্রামের মাটি তোমার আত্মায় লেগে আছে।'[৩২]

১১. 'হে নিষ্ঠুর জন্মদাতা, ভাগ্যহত তোমার সন্তান
শিশুর স্বভাবে কেন কোনোদিন খেলতে পারেনি
একটি সুন্দর স্বপ্নে, রবারের বলের মতন।
অথচ হে জাদুকর, কী সহজে অবহেলাভরে
মনোরম স্বপ্নবাজি পুতুলের মতন নাচাও।'[৩৩]

১২. 'জন্মেই কুঁকড়ে গেছি মাতৃজরায়ন থেকে নেমে—
সোনালি পিচ্ছিল পেট আমাকে উগরে ছিলো যেন
দীপহীন ল্যাম্পপোস্টের নীচে, সন্ত্রস্ত শহরে
নিমজ্জিত সব কিছু, রুদ্ধচক্ষু সেই ব্ল্যাক-আউটে আঁধারে।'[৩৪]

১৩. 'পঁচিশ বছর বয়সে
আমার শরীর থেকে প্রথম ডালপালা বেরোয়, আর
শীতরাত্রির গাছগুলির মতো আমি
নিঃসাড় হয়ে যাই;
কিন্তু ক্রমেই সতেজ ও সজীব আমাকে ঘিরে
ফুল ফোটে, ফল ধরে,
সুবাসিত আমার বুকে বাসা বাঁধে
এক জোড়া নৈঃশব্দ্যবিলাসী পাখি।

তারপর আমার পঁচিশ বছর বয়স
এক ব্যাধ ও তার বন্ধু এক কাঠুরের সঙ্গে
খুনোখুনির খেলায় ফুরিয়ে যায়।'[৩৫]

১৪. 'যে কোনো ব্রীজের পাশে শুরু হয় আমাদের শৈশবের খেলা
যে কোনো ব্রীজের বুকে গড়ে ওঠে আমাদের যৌবনের মুখ
যে কোনো ব্রীজের শেষে পড়ে থাকে আমাদের বার্ধক্যের স্মৃতি
ইতিহাস গড়ে ওঠে ব্রীজে ব্রীজে সময়ের ধ্রুপদ সিঁড়িতে

এখন অসংখ্য ব্রীজ ছিন্নভিন্ন গৃহযুদ্ধে উড়ে আসে বোমারু বিমান
আমার শৈশব যায় আমার যৌবন যায় বার্ধক্যের স্মৃতি মুছে যায়
ইতিহাস ছিন্ন হয় দূরত্ব বিস্তৃত হয় ক্ষুব্ধ হয় অন্তিম বিলয়
আবার ব্রীজের কাজ শুরু হলে, কি আশ্চর্য, ফেরে নাকি বহতা সময়!'[৩৬]

উদ্ধৃতিগুলো কবিতায় কবির, সামাজিক মানুষের যুগবিধৃত শৈশব-কৈশোর-যৌবন-বার্ধক্যের স্বরূপচেতনার চিত্রময় বাণীরূপ। এগুলিতে কালপর্যায়সমূহের নিতান্ত নিরীহ-সরল স্মৃতিচারণও আছে বটে, কিন্তু সমগ্রতায় পর্যবেক্ষণ করলে সুস্পষ্ট প্রতিভাত

হয় যে, ব্যক্তিগত জীবনায়ুর কালস্তরগত অভীপ্সাগুলোকে সমষ্টির দ্বন্দ্বময় জীবন-পরিস্থিতি ও পরিপার্শ্ব চেতনায় স্থাপন করে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অস্তিত্বের স্বরূপ অন্বেষণের কবি-প্রবণতাই এগুলিতে মুখ্য হয়ে উঠেছে। এ সচল জীবনের স্বাভাবিক স্থান-কাল পরিবর্তনজনিত বিচ্ছেদ চিন্তা নয়, সম্পন্ন প্রবাসীর অলস সুখস্মৃতি রোমন্থন নয়, স্থান, সময় ও স্বপ্নের মূল ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িতদের ক্ষোভযন্ত্রণাদগ্ধ, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠামথিত রক্তাক্ত স্মৃতিচারণ। কেবলি লাল বল, নীল বেলুন, রঙ্গীন ঘুড়ি, হলুদ পাখি, শিশির ভেজা শিউলি-বকুল, নদীর ঘাট, চরের বালি, স্কুল-পালানোর আনন্দ, চুল খোলা কিশোরী আর গোপন চিঠির, কিংবা ‘অন্তহীন ঠাকুরমার ঝুলি, খরস্রোতা লৌহজঙ্ঘা—ওপারে লালবাড়ী, শিশিরে গন্ধভরা অন্তহীন পায়ে-চলা পথ, দীর্ঘ ঘুমের ভেতরে নীল জল’—এর[৩৭] স্মৃতি নয়, কবির মনে শৈশব-কৈশোরের স্মৃতি মানে জন্মেই ব্ল্যাক-আউটে কুঁকড়ে যাওয়া, বিশ্বযুদ্ধ, দাঙ্গা, আগুন, আর ছেচল্লিশে বেড়ে ওঠা অসুখী কিশোরের মুখ, কুয়োর মতো গভীর দু'চোখ অশ্রু-ভেজা মা, অনাবাদী জমির মতো ধূ-ধূ-দৃষ্টি বাবা এবং বিষণ্ণ মুখ অগ্রজের হিমশীতল করতলের স্পর্শ, বালক উদ্বাস্তুর ডাগর কালো চোখের সামনে প্রসারিত ধূসর সড়ক আর নদীসেতু, প্রবীণ লাঙল, বৃদ্ধ বলদ, তোবড়ানো গাল, ক্লিষ্ট হাসির স্মৃতিও। যুদ্ধবাজ সাইরেনে উচচকিত কৈশোর এবং দাঙ্গাহাঙ্গামা-দুর্ভিক্ষবিদ্ধ যৌবন কেবল অগণিত লাশ ও শবাধারের স্মৃতি, হতাশা-বিদ্ধ বার্ধক্য আত্মহননচিন্তায় অস্থির। কবিতায় প্রমূর্ত ট্রাজেডী এই যে, মানুষ ও প্রকৃতি গান, সুর, রঙ, রূপ ও স্বপ্ন দিয়ে যে কিশোরের হৃৎপিণ্ডটিকে একদিন ভরে দিয়েছিল, আজ যৌবনে সেই হৃদরক্তজড়িত সৌন্দর্য বোধ—সম্পদের বিনিময়ে সে একটু নিরাপত্তা ভিক্ষা করছে। জাদুকরের হাতে শাশ্বত স্বপ্ন প্রতিনিয়ত দোদুল্যমান, কিন্তু স্বপ্নহীনতায় তার রাত কাটে। আর যৌবন মানে সতেজ বৃক্ষের নবোদ্‌গত শাখা-প্রশাখা, সেই শাখা-প্রশাখায় ফুল-ফল ও বিহঙ্গ-কাকলির পরিপূর্ণতা, এবং একই সঙ্গে, যৌবন মানে তীক্ষ্ণসতর্ক কাঠুরিয়া ও শিকারীর অস্ত্রাঘাতে বৃক্ষ ও স্বপ্নবিহঙ্গের ত্বরিত সর্বনাশ। কৈশোর ও যৌবন ব্যর্থ বলে বার্ধক্যও ব্যর্থ,—জীবনের প্রতিটি সময় একে অপরের দিকে মুখ ফিরিয়ে থাকে, পরস্পর পরস্পরকে ব্যঙ্গ করে। কিন্তু ক্ষয়সর্বস্বতাই হবে বার্ধক্যের অর্থ, এমন কথা ছিলো না :

> ‘তোমাদের কেমন করে বলবো সব বার্ধক্যই এমন হয়না।
> একি আমারও পরিণাম?
> এমন বার্ধক্যও আছে, তরুণের উচচকিত উদ্বোধনী গানের মতোই
> তা' নিঃসংশয়, জীবনের শুরুর মতোই তা'শেষ হয় প্রাণের শীর্ষ আনন্দে
> কাঁপতে কাঁপতে চারপাশের অন্তহীন সুখে ছড়িয়ে। সে স্বপ্ন আমি কিছুতেই চোখ থেকে মুছে
> ফেলতে পারি না।’[৩৮]

সমাজের সুস্থতাই ব্যক্তিসত্তার স্বাধীন বিকাশে সঙ্গত আনুকূল্য দান করে। বিনষ্ট সমাজে ব্যক্তির মূল অস্তিত্বই সঙ্কটাপন্ন বলে তার ক্রমবিকাশের অর্থ তার পঙ্গুতার ক্রমবিকাশ। বার্ধক্য পরিণামহীন, কারণ পর্যায়ক্রমে পরিণামহীন শৈশব-কৈশোর-যৌবনের মধ্য দিয়েই তাকে হামাগুড়ি দিয়ে আসতে হয়েছে। কবিকে তাই বলতে হয়েছে, ‘নদী পেরুনোর শক্তি লুপ্ত, কেমন তলিয়ে যাই পরিণামহীন’।[৩৯] নিজের এই পরিণামহীন বিধ্বস্ত অস্তিত্বকে কবি যখন নিজেই সন্তর্পণে উদ্‌ঘাটন করে দেখেন, তখন তাঁর কণ্ঠের এই মর্মান্তিক উচচারণে ঘোষিত হয়, ‘অন্ধকার আমার মুখ, ঘৃণা আমার আবেগ; যন্ত্রণা আমার জীবন, অবিশ্বাসই আমার দ্বন্দ্ব; আমার নির্জন জ্ঞানে আমি পাপী, অনন্য অস্তিত্বে আমি ভারবাহী।’[৪০]

[চার]

স্থান-কাল-সমষ্টি ও প্রকৃতি থেকে বিতাড়িত বিনষ্ট সমাজের ‘নি-শিকড় সত্তার দ্বীপে’ বন্দী-নিঃসঙ্গ ব্যক্তিমানুষটির ভেতরসত্তাটিও চৌচির। তার জ্ঞান ও বিশ্বাস, স্বপ্ন ও আবেগ, কল্পনা ও অভিজ্ঞতা, প্রেম ও প্রিয়জন, বস্তুবোধ ও ভাববোধ, প্রতিভা ও সৃজনশীলতা, চরিত্র ও আচরণের মধ্যে স্ববিরুদ্ধতার ফাটল, তার কণ্ঠ পরস্পরবিরোধী উচ্চারণে শিথিল। কবিতায় ব্যক্তির আত্মপ্রকৃতি এ-ভাবে প্রতিফলিত :

১. ‘নদী পেরুনোর
শক্তি লুপ্ত, কেমন তলিয়ে যাই পরিণামহীন।
চিনতিস তুই যাকে, সে আমার মধ্য থেকে উঠে অন্তরালে
চলে গেছে। তুই বাচ্চু, তুই বড়ো ছেলেমানুষ, অবুঝ।
কী বললি? শামসুর রাহমান নামক ধূসর
ভদ্রলোকটির
সমান বয়সী তুই?’

‘এখন এই তো আমি। চিনতিস তুই যাকে সে আমার
মধ্য থেকে উঠে
বিষম সুদূর ধূ-ধূ অন্তরালে চলে গেছে। তুইও যা, চ’লে যা।’[৪১]

২. ‘আমি এক কঙ্কালকে সঙ্গে নিয়ে চলি দিনরাত
অসঙ্কোচে, আতঙ্কের মুখোমুখি কখনো হঠাৎ
তাকে করি আলিঙ্গন, প্রাণপণে ডাক নামে ডাকি
দাঁড়িয়ে সত্তার দ্বীপে নি-শিকড়, একা, আর ঢাকি
ভীত মুখ তারই হাতে।’[৪২]

৩. ‘এবং আমার
একটি শনাক্ত পত্র আছে নিত্যসঙ্গী
যেমন শহুরে সব পোষা কুকুরের
গলায় ঝুলানো থাকে চাকতি রূপালি।’[৪৩]

৪. ‘এ তো ক্যামুর ওরান শহর নয়,
ঋতুমালা বিতাড়িত
সরল প্রকৃতির সহজ উদ্ভব রহিত,
জন্মদাতৃ মাটির
প্রজনন শক্তি ছিঁড়ে নেয়া
এতো অক্ষম ক্ষেত্র নয়,
এতো নয় সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন
স্মৃতিহীন সূত্রহীন স্নায়ুহীন
নিজেরই সর্বস্বতায় বন্দিনী বন্দর।’

‘তবু কেমন করে
হানাবাড়ীর বাসিন্দার মত হয়ে গেলাম আমি?’[৪৪]

৫. ‘আমরা সবাই আমাদের নামকে
ভুলে গেছি, মনুষ্যত্বের নিশ্চিত সংজ্ঞাকে ভুলে গেছি।
মৃত্যুর নামও ভুলে গেছি?
প্রার্থনার দুহাত স্তম্ভের মতো স্থূল
হয়ে গেলো, পারি না স্পর্শ করতে আকাশ, পারি না
মাটিকে মেখে নিতে।

আমার নির্জন জ্ঞানে আমি পাপী, অনন্য অস্তিত্বে আমি ভারবাহী।’[৪৫]

৬. ‘সত্তায় নিবিড় থেকে
অবিচল পায়ে হেঁটে যাবো এমন শুকনো শক্ত
মাটি নেই কোথাও জীবনে, চোরাবালি নেয় টেনে
বিচিত্র আপোষে, নিজেরই একান্ত রক্ত নীরব ক্ষরণে
লেখে নাম বাঁকে বাঁকে, নিজেরই বিদ্রূপ হাঁকে
বিভিন্ন বিরোধী উচ্চারণে।’[৪৬]

৭. ‘যে সব ভারসাম্যহীন মানুষ সত্যের চেয়ে
স্বপ্নকে বড়ো বলে ভাবতো, একদা
আমি ছিলাম তাদের দলে।
আজকাল বাতি নিভিয়ে ঘুমোতে পর্যন্ত
সাহস হয় না।’[৪৭]

৮. ‘মানুষের রক্ত, বিষ্ঠা অতিরিক্ত ঘামে ও বমনে
হায় খোদা, শেষ মেষ তোমার এ শুদ্ধতম শিল্প ভেসে যায়।’[৪৮]

৯. ‘এই যান্ত্রিক উজ্জ্বল বিবিক্ত মত্ত নগ্নতার চাবুকে
আমরা আজ ছিন্ন ভিন্ন
আমরা শঙ্কিত নিজেদের নিষ্ঠুর নিঃস্বতায়’

‘আমরা শঙ্কিত
নিজেদের জ্ঞানের ইচ্ছার প্রেমের এবং পিপাসার
আলোকোজ্জ্বল কুৎসিত নগ্নতায়
স্বর্ণাভ এক সভ্যতার অশ্লীল শৃঙ্গারে
আমরা আজ বিধ্বস্ত’[৪৯]

১০. ‘সত্য ও অসত্যের মিশ্রতনু
দুরারোগ্য স্ফীত
চূর্ণ অস্থিমেদ।
এখনো জনৈক ঋষি
গানের ভাষায় বলে
অনর্গল হিতকথা’[৫০]

১১. ‘এখন আমার বছর কাটে বিদেশ বিভূঁয়ে
নানা স্থানে, বেশির ভাগ হোটেলের ভাড়াটে কামরায় স্টেশনের

ওয়েটিং রুমে, বছরে দু'একবার হাসপাতালে, কখনো কখনো
                                        পুলিশ ফাঁড়িতেও যাই
ইতস্ততঃ ভবঘুরের মতো ঘুরি, ইদানীং আমি সংবাদ সংগ্রহে
বড়ো বেশি ব্যস্ত থাকি, কেবল আমার সংবাদ আজ আমার কাছে নিতান্ত
অজ্ঞাত'[৫১]

ঋতুমালাবিতাড়িত, স্বনামভ্রষ্ট, স্বপ্নাতঙ্কগ্রস্ত, স্ববিরোধীকণ্ঠ, সভ্যতার অশ্লীল শৃঙ্গারে বিধ্বস্ত, আত্মপরিচয়হীন পরিণামহীন, সমগ্রতাস্খলিত, ভেতরে-বাইরে খণ্ডিত, বহুপতনে চূর্ণিত ব্যক্তিমানুষের এই আত্মপ্রতিকৃতি। কবির আত্মপরিচয় দানে কোনো ছদ্মাবরণ নেই :

'আমি ব্যথিত পূর্ববাংলার ঈপ্সিত আলেখ্যের
চৌচির প্রতিলিপি, মুখ থুবড়ে থাকা মানবতা
উদ্বাহু প্রগতির ধৃতরাষ্ট্র-বাহুবেষ্টনে ?
জীবন্ত নিহত আমি জীবনের ঘণ্টারোলে,
                        জীবনের ঘণ্টারোলে
কে তোলে শঙ্খধ্বনি তবু, মসাজদে আজান ?'[৫২]

স্পষ্টতঃ ব্যক্তিজীবনের এই শোচনীয় পরিণামবোধ ও ব্যক্তিকবিচিত্তের এই হাহাকার কবিতায় অতি আত্মগত কণ্ডূয়নে সর্বদাই সঙ্কুচিত ও নিঃশেষিত নয়, সমষ্টি ও সমগ্রের পরিণাম ভাবনাতেও সম্প্রসারিত। অর্থাৎ কবিচিত্তের এই রক্তাক্ত যন্ত্রণা যে ব্যক্তি-কবির সামাজিক অস্তিত্বচেতনা থেকেও উৎসারিত সে-সত্য কবিতায় অস্ফুট থাকেনি। যন্ত্রণার এই উপলব্ধি সকরুণ, কেননা, বাস্তব জীবনে তা মর্মান্তিকভাবে সত্য ; এবং ভয়াবহ, কেননা, মানবিক আকাঙ্ক্ষা যেখানে ব্যক্তি, সমষ্টি ও প্রকৃতি-জগতে বিদ্যমান অস্তিত্বের অনুকূল উপাদান আবিষ্কার, উদ্‌ঘাটন ও উপভোগে উৎকণ্ঠিত, প্রভুত্ববাদী শ্রেণী সেখানে তার আপন স্বার্থে সে-গুলিতে প্রচ্ছন্ন প্রতিকূল উপাদান-শক্তিসমূহকে উগ্রতর ও প্রচণ্ডতর করে তুলে মানবিক মূল্যবোধভিত্তিক সকল সম্পর্ককে চূড়ান্তভাবে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে অধিক তৎপর। ফলে সমষ্টি, ব্যক্তি ও বস্তুবিশ্ব কেবল পরস্পর পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্নই নয়, খণ্ডিত সকল সত্তার ভগ্নাংশগুলি পরস্পর পরস্পরের বিরোধী শক্তিতেও রূপান্তরিত। এবং বৃহৎ শক্তি ও শ্রেণীসমূহ এই সুপরিকল্পিত বিরোধকে সচল রাখতে ক্রমাগত কৃত্রিম অমানবিক সব ঘটনা ও পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে, এবং সকল নিয়ন্ত্রিত কার্য-কারণ ও আকাঙ্ক্ষিত ফলাফলের ওপর অদ্ভুত সব দার্শনিক ব্যাখ্যা-ব্যঞ্জনা আরোপ করে মানুষের মধ্যে দৈবনির্ভরতা, নিয়তিবাদ ও নৈরাশ্যবাদের প্রসার ঘটাচ্ছে। ফলে অবৈধ ও অসমদ্বন্দ্বে পরাভূত মানুষের সকল যন্ত্রণা কবিতার এমন দুর্ভাগ্যজনক চরণে এসে হাহাশ্বাস ফেলছে : 'মানবিক নির্মাণের প্রতি আমি আস্থা হারিয়েছি।'[৫৩]

অতঃপর সব কিছুই ছিন্ন ও চৌচির, অবিচ্ছিন্ন কেবল এক যন্ত্রণাবোধ। কবিতাকর্মের মধ্য দিয়ে অস্তিত্বের স্বরূপ অনুসন্ধান ও অনুভব তাই যন্ত্রণাকাতর এক নিঃসঙ্গ নিঃস্বের ভগ্নাংশ সংগ্রহে ও সেগুলির অতৃপ্ত আস্বাদনে, অথবা বায়বীয় দার্শনিক আনন্দবোধবাষ্পেস্ফীত এক ভ্রান্ত পরিতৃপ্তি-মুগ্ধতায় সীমিত। কবিতা প্রেম, সৌন্দর্য, স্বপ্ন, সঙ্গীত, বিশুদ্ধনান্দনিক অভিসার, এবং সামগ্রিকভাবে কবিকর্মে শৈল্পিক উত্তুঙ্গতা অর্জনের প্রতি কবিদের প্রগাঢ় অনুরাগ ও সশ্রম প্রতিশ্রুতির অপ্রচ্ছন্ন স্বাক্ষরও বহন করছে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে-সব যেন আপন নিভৃত নির্জন কক্ষে বসে লুণ্ঠিত কণ্ঠহার থেকে স্খলিত একটি ভগ্ন স্বর্ণকণাকে বার বার ঘষে-মেজে স্মৃতিদীপ্ত করে

রাখার সান্ত্বনা, কবিপ্রাণতাকে স্পন্দিত করে রাখার অন্তিম প্রচেষ্টা ; যেন, 'শিল্পে অনুরাগ-আছে-মানুষের সীমাবদ্ধ জলে চলে ব্যক্তিত্বের হালফিল চাষ,'[৫৪] এবং এ-ভাবে সীমাবদ্ধ কর্ষণের মধ্য দিয়ে বিনয়-বিশুদ্ধ কিছু ফসল ফলানো :

> 'বহিরঙ্গে নাগরিক—অন্তরঙ্গে অতৃপ্ত কৃষক ;
> স্থান-কাল-পরিপার্শ্বে নিজ হাতে চাষাবাদ করি
> সামান্য আপন জমি, বর্গা-জমি চষি না কখনো।
> বিস্তীর্ণ প্রেইরী নয়—আপনার সীমিত সবুজে
> পরম নিশ্চিন্তে চরে নীল গাই, যূথবদ্ধ মেষ,
> নিরীহ হরিণগুচ্ছ, নৃত্যপর জেব্রা ও জিরাফ।।'[৫৫]

এতো সেই স্থান-কাল-পরিপার্শ্ব সংলগ্ন অস্তিত্বের নির্দ্বন্দ্ব উপভোগ-স্বপ্ন, অভিমানাহত বিনয়ে অঙ্গীকারবদ্ধ কবি যাকে সঙ্গত ও সম্পন্ন করে তুলতে চান, ব্যক্তিমানুষ ও সমষ্টি-মানুষের পিপাসিত চিত্তের সেই অমল অভীপ্সা—তৃণাচ্ছাদিত চত্বরের মতো একখণ্ড সবুজ মনোভূমিতে নিশ্চিন্ত নীল গাই, ধবল-কোমল মেষশ্রেণী, সুশ্রীতনু হরিণ, উল্লাসপ্রিয় জিরাফ-জেব্রার প্রতীকে প্রসন্নমধুর প্রশান্তস্নিগ্ধ নির্দ্বন্দ্ব অনুভব-উপভোগের নিরবচ্ছিন্ন তৃপ্তিকে ললিত-লালনের আকাঙক্ষা, সেই স্বেচ্ছাভ্রান্তিরঞ্জিত চিত্তে নীলিমাস্পর্শী বর্ণালি বিস্তার :

> 'একদিন বিকেল-আকাশের মেঘকে
> পলাশগুচ্ছ ব'লে ভুল করেছিলাম
> সেদিন হৃদয় নিশ্চিন্তে চোখ মেলে
> আকাশকে আয়ত্তে আন্‌তে চেয়েছিলো
> কখনও পলাশ কখনও রজনীগন্ধা
> কখনও বা শুধু সাদা মেঘ
> হঠাৎ হয়তোবা নরম বরফের ফেনা
> সব কিছু মিলে একটি নিমজ্জিত আনন্দের
> অপরাহ্ন।' [৫৬]

স্বপ্ন অস্তিত্বের জ্যোতির্ময় অমল পিপাসা ও তৃপ্তি, অস্তিত্বের শর্ত ও প্রমাণ, কেননা স্বপ্ন মানে আকাঙক্ষা, এবং আকাঙক্ষা মানে অস্তিত্ব। স্বপ্ন একটি আশ্বাস, একটি বিশ্বাস, একটি মানবিক অহঙ্কার, দম্ভ এবং বিনয় :

> 'আমরা যেখানে যাবো, সেই বিশাল উপত্যকার ছবি
> আমাদের সমস্ত অন্তরকে গ্রাস করে আছে। আমাদের পতাকায়
>
> রূপকথার বাতাস ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। ভবিষ্যৎ
> আমাদের আশাকে দোলাচ্ছে সোনালি দোলকের মতো,
> বারবার।
>
> আনন্দে আপ্লুত হয়ে আমরা স্বপ্নের দিকে
> রওনা দিয়েছি। দুঃখ
> আমাদের ক্লান্ত করে না।

দুর্যোগের রাতে আমরা এক উজ্জ্বল দিনের দিকে
মুখ ফিরিয়েছি। বিঘ্ন
আমাদের বিবশ করেনি।
চীৎকার, কান্না ও হতাশার গোলকধাঁধা ছেড়ে
আমরা বেরিয়ে যাবো। মৃত্যু
আমাদের স্পর্শ না করুক।

স্বপ্নের সানুদেশে আমরা শস্যের বীজ ছড়িয়ে দেবো
বাম দিকে বয়ে যাবে রূপোলি নদীর জল, ডানে
তীক্ষ্ণ তৃষিত পর্বত।'[৫৭]

কিন্তু মূল মনোভূমি তো চৌচির, সবুজতাহীন, কর্কশ, বিমুখ, অনুর্বর বিধ্বস্ত এক খামার, একান্ত সীমিত খামার নয়, জন্মোই কুঁকড়ে-যাওয়া শৈশব থেকে 'স্মৃতির দারুণ শীতে বিদ্ধ জীর্ণ অস্থি, লোলিত জিহ্বা স্খলিত-স্খলিত উচচারণ বার্ধক্য'[৫৮] পর্যন্ত—এক শতাব্দী থেকে আর এক শতাব্দী পর্যন্ত প্রসারিত, আর সেই 'মৃত্যুর শিকড় ঢাকা জীবনের সহস্র ফাটলে আমার দু'চোখ থেকে অশ্রু পড়ে গলে'।[৫৯] তাই আমাদের কবিতায় প্রেম-সৌন্দর্য-কল্যাণের স্বপ্ন কখনো নিয়তিকাতরতায় অশ্রুকরুণ, কখনো অতিপ্রাকৃতবাদ, পরাবাস্তববাদ, ধোঁয়ানীল ভাববাদাশ্রয়ী, কখনো তা অমল করুণ বিনয়ে 'বেদনা-হলুদ-বৃন্তে' বিকশিত সুশুভ্র শেফালিকা, কখনো ক্রোধে নীল যন্ত্রণার ঋজু বৃন্তে পুষ্পিত রক্তোজ্জ্বল কৃষ্ণচূড়ার অগ্নিস্তবক। স্বপ্ন কখনো কখনো নিষ্ঠুর সত্যের চেয়েও ভয়ঙ্কর, ভীতিপ্রদ,—'আজকাল বাতি নিভিয়ে ঘুমোতে পর্যন্ত সাহস হয় না'—ভয়, দুঃস্বপ্নের। দ্বিধা-দ্বন্দ্ব নিরপেক্ষ, নিরুদ্বিগ্ন, শোকহীন-তাপহীন, জ্বরহীন-জরাহীন, আনন্দ-ঘন-উল্লাসঘন-তৃপ্তিঘন কবিতার জন্মের জন্য কবিজীবনের অনেক মুহূর্ত অনেক বিন্দু-প্রহর কখনো কখনো উর্বরও হয়ে ওঠে। কবিতা তখন কেবল কবিতাময়, বাসনাবিশ্বের সম্পদকণা হয়ে ওঠে। কণাসম্পদ, কেননা, তা বিদ্যমান অস্তিত্বের সমগ্রতার প্রতিভাস নয়। সম্পদ, কেননা, ক্ষণমুহূর্তের স্ফুলিঙ্গপুঞ্জ হলেও তা সুস্বপ্নের মতো আমাদের জীবন-বিশ্বাস ও জীবনমোহকে জাগ্রত করে রাখে:

'কোনোখানে আজো ঝিলিক দেখলে
ক্বচিৎ সুন্দরের
একটি কণিকা অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের,
হঠাৎ আত্মবিস্মৃতি নেমে আসে—
মনে মনে ভাবি: আহা কল্যাণ হ'ক
স্ফুলিঙ্গটুকু অশেষ আকাশে
দীপ্ত সূর্য হ'ক।'[৬০]

কবিতার প্রতিশ্রুতি আলোর কাছে, আনন্দের কাছে, স্বপ্নের কাছে, জীবনের উজ্জ্বলতম অভীপ্সার কাছে, একই সঙ্গে স্থান-কাল-মানুষ-পরিপার্শ্ব সংলগ্ন জীবন বাস্তবতার কাছে, জীবন-অভিজ্ঞতার কাছে, অভিজ্ঞতার আলোকে অবলোকিত ও পরিকল্পিত জীবন ভাবনার কাছে। কিন্তু 'বিশুদ্ধ' নন্দনরাগেরঞ্জিত, অপ্সরামঞ্জীরধ্বনিতে সদাসম্মোহিত চিত্তের লোকাতীত উল্লাসে স্পন্দিত বলে ভাবিত অনেক কবিপ্রেরণার উৎসে বিচ্ছিন্ন ও চূর্ণিত অস্তিত্বের কোনো খণ্ডকে, ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন সময়ের কোনো দণ্ডকে অখণ্ড বলে বিশ্বাস করার নিরীহ সরল ভ্রান্তি, আত্মসান্ত্বনাবোধ, অথবা ঐতিহ্যমোহন প্ররোচনায় আস্থাবোধ প্রচ্ছন্ন আছে।

[পাঁচ]

কবিতার উৎসভূমি কবিচিত্ত কেবল বিচিত্র বোধ-উপলব্ধির নিবাস-নিকেতনই নয়, জীবনজিজ্ঞাসা ও জীবনপ্রেরণারও উদ্যমলোক। বোধ-উপলব্ধি হচ্ছে জীবনের অভিজ্ঞতার সম্পদ, জিজ্ঞাসা হচ্ছে অতীত ও বর্তমানের স্থান-কাল-মানুষ-পরিপার্শ্ব-পরিস্থিতি, ও সেই অভিজ্ঞতার সমগ্রতার ভিতরে জীবনসত্যের রহস্য উদ্‌ঘাটনের কৌতূহল, এবং প্রেরণা হচ্ছে উদ্‌ঘাটিত সেই সত্যের আলোকে পরিকল্পিত জীবনায়ন অর্জনের লক্ষ্যে সক্রিয় আকাঙ্ক্ষার স্পন্দিত আবেগ। কবিতা তাই অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনসত্য ও পরিকল্পিত জীবনভাবনার অদ্বৈত ও শিল্পব্যঞ্জনাময় সচেতন প্রকাশ। আমাদের অস্তিত্বসচেতন কবিতায় বিধৃত কালের জীবন-অভিজ্ঞতা ও জীবনসত্য করুণ ও নিষ্ঠুর, কিন্তু বিশৃস্ত। এবং কবিতা কেবল অভিজ্ঞতার নিরীহ বাহক নয়, পরিকল্পিত জীবনায়নলাভের আকাঙ্ক্ষারও ধারক, অন্ততঃ সে জীবনের বিচ্ছিন্ন অংশগুলোকে ফিরে পাবার ও চূর্ণিত সত্তার পূর্ণ অবয়বটিকে বোধ-কল্পনার পরিধিসীমায় আকর্ষণের আকাঙ্ক্ষায়, এবং ব্যক্তিচেতনার খণ্ডদ্বীপে দাঁড়িয়ে সমষ্টি ও সমগ্রতার মূল ভূভাগের দিকে বাহুবিস্তারের উজ্জ্বল-করুণ উৎকণ্ঠায় স্পন্দিত তো বটে:

১. 'মাতার আলিঙ্গন আর পিতার বরাভয় থেকে বিচ্ছিন্ন আমরা
আতঙ্ক এবং বিদ্বেষের বিষে
বিধ্বস্ত হওয়ার আগে এসো
দীর্ণবুক মৃত্তিকার রক্তরেখায় পা চালিয়ে
আমাদের পরিত্যক্ত বাসভূমির দিকে ফিরে যাই।'৬১

২. 'জীবনের কোনো প্রান্তে আজো আছে নীড়
সেখানে রয়েছে আজো বৃহত্তর বাসনার ভীড়।
সেই শেষ পথপ্রান্তে অর্জিত গৌরবে
একদিন আমাকে যে আসতেই হবে।'৬২

৩. 'এই অন্ধকারের বন্যা পেরিয়ে
প্রথম যে দ্বীপের মিনার জাগবে
যন্ত্রণার অম্লান বেদী মাটির সে আবেগে যাবোই
সেখানে যাবোই।'৬৩

৪. 'সামান্য আবেশ এলে ভেসে যাই নূহের নৌকায়
অথবা উড়াল দিই আশার পাখিটি একা একা
প্রবল হাওয়ার মধ্যে আদিগন্ত শোকের কিনারে
নিঃশব্দে উড়তে থাকি ঢেউয়ে ঢেউয়ে, যদি কোনদিন,
আদিম উদ্ভিদরেখা দেখা দেয়— কোমল কৌশিক
দারুণ বালুর বেগ, দিগ্বিজয়ী মাটির মহিমা।'৬৪

৫. 'আবাল্য তোমার যে নিসর্গ ছিলো নিদারুণ নির্বিকার,
সুরক্ষিত দুর্গের মতন আমাদের প্রতিরোধে সে হলো সহায়,
ব্ল্যাক আউট অমান্য করে তুমি দিগন্তে জ্বেলে দিলে
বিদ্রোহী পূর্ণিমা। আমি সেই পূর্ণিমার আলোয় দেখেছি:
আমরা সবাই ফিরছি আবার নিজস্ব উঠোন পার হ'য়ে
নিজেদের ঘরে।'৬৫

৬. ‘আর এক নদী এগুলেই আমরা নতুন এক মহাদেশ পাবো,
সেখানে সবুজ পাতা ফুটে আছে জীবনের গাছে, মৃত্যুহীন।
কলম্বাস এই দেখো নূহের নৌকার সেই ক্লান্ত কবুতর
কী সুন্দর জলতরঙ্গের শীর্ষে বসেছে পাখা মেলে।
সমুদ্রের তলদেশ ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে দ্রুত
এক নব ভৌগোলিক শিখার আগুন,
তার সে কি লেলিহান মুখ।
মৃত্যুকে নিক্ষেপ করো সেই সর্বজয়া অগ্নির ভিতরে,
জীবনের হাত ধরে সে উঠবে বেঁচে। মৃত্যুকে বাঁচাও।
একটা পৃথিবী আছে যেখানে মৃত্যুর শেষ,
আমরা ওখানে যাবো।’[৬৬]

৭. ‘প্রাসাদের কাঁচচূর্ণ অশ্রু হয়ে লেগে থাকে আমার দুচোখে—
আমি তাকে জড়ো করি, দুই হাতে
বনে যাই দক্ষ কারিগর;
অসংখ্য অনন্ত-খণ্ড জোড়া দিতে দিতে
বুনে চলি নক্‌সী কাঁথা, নক্ষত্রের উল্কি হাঁকা
অনঙ্গ অভঙ্গ এক স্বপ্নের প্রাসাদ;
বুনতে বুনতে বেড়ে উঠি, বুনতে বুনতে বুড়ো হয়ে যাই;
আমার অস্তিত্ব জুড়ে অসংখ্য সূতোর দাগ,
বুকের গভীরে ঘোরে জন্মস্মর সূতো-কাটা ফল,
শিরায় শোণিত-স্রোতে
সূতোর মতন কত শ্বেত শুভ্র নদী;
পলিহীন প্লাবনবিহীন
সে নদীতে ভেসে ওঠে নাওয়ের বহর, বুকে তার
হাসন-লালন আর এক তারে বাঁধা লক্ষ সাঁই;
পুনর্বার
এই ডাঙ্গা ছেড়ে যাই শ’খণ্ড স্বদেশ ছেড়ে অখণ্ড স্বদেশে
যাই মূল স্বপ্নে যাই।’[৬৭]

অভীপ্সাঘনিষ্ঠ কবিতার এই স্তবক-চরণগুলো ইংগিত করে যে, কবিতা কেবল ‘মৃত্যুর শিকড় ঢাকা জীবনের সহস্র ফাটলে কবির দু’চোখের অবিরল অশ্রুপাত’ নয়, ফাটলের ভেতর থেকে উদ্‌গত তৃণকিশলয়ের মতো তাঁর দু’চোখের সবুজ আলোর শিখাও; কবিতা মানে বিষয়বাদী অভিজ্ঞতার আলোকে উদ্‌ঘাটিত সত্যের ওপর দাঁড়িয়ে কল্পনা-পরিকল্পিত জীবনায়নের জন্য সমষ্টি-সচেতন আত্মবাদী আকাঙক্ষা-প্রেরণায় কবিচিত্তের স্পন্দিত হওয়া; কবিতা মানে দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষক্ষত জীবন-অস্তিত্বের প্রগাঢ়তম অন্ধকার উদ্‌ঘাটন এবং অস্তিত্বের অনির্বাণ জ্যোতির্ময়তা উন্মোচন; কবিতা মানে মুক্তি এবং স্বস্তির আশ্বাস:

‘যতবার অন্ধকার নির্মম ভ্রূকুটি হানে, ততবার পাই যে সান্ত্বনা
মৃত্যুর অতীত কোনো, জীবনের দেশে পাই, নতুন আশ্রয়।
নৈরাশ্যের দ্বার প্রান্তে আমার আকাঙক্ষা জ্বলে শিখার মতন
সে আশা আমার সত্তা আমার সাহস।’[৬৮]

‘দেখেছি মৃত্যুকে রক্তে আঘাতের
দুঃসাহস অথবা বিনাশে ; তবু এই মৃত্যু আজ
প্রস্ফুটিত আলোকের মতো আমার নিকটে ; আর
কম্পমান বৃক্ষের শিকড়ে। আমাদের শির নুয়ে
আসে দিবসোত্তর ক্লান্তিতে, স্বপ্ন দেখি গৃহাঙ্গন
সুখ-শয্যা পেতেছে সন্ধ্যায়। এক মুঠি স্বর্গ যেন
কল্পনায় গৃহের বিশ্রাম। কখনো হয়তো থাকে
অপরিশোধ্য ঋণভার, সংস্কার অপেক্ষায় ভগ্ন
গৃহে সাধের আসন ; নব নব পরাভবে অগ্রসর
তবু হই।’[৬৯]

সুতরাং কেবল সত্তার বিপন্নতা-বিষণ্ণতার অনুভব নয়, সঙ্কট উত্তরণের সুতীব্র আকাঙক্ষাও কবিপ্রেরণার উৎসে পরিণত। এই সূত্র ধরেই একের জাগ্রত আত্মবোধের সঙ্গে বহুর জাগরণোন্মুখ সত্তাবোধের মিলন ঘটে, এবং কবিতার আবেদন সামাজিক হয়ে ওঠে। সামাজিক সঙ্কট উত্তরণে কবিতার মুখ্য কোনো ভূমিকা নেই, অথচ সামাজিক উত্তরণ ছাড়া কবিতারও উত্তরণ নেই। (উন্নত সমাজের বিশেষ আলো-মাটি-জল-হাওয়ায় উৎকর্ষিত কাব্য-শিল্পের স্বভাবসিদ্ধ রূপ-রস-রক্তের উত্তেজনা-উত্তুঙ্গ ঋণে আমাদের কবিতার স্বাস্থ্যোদ্ধার প্রয়াসের সাফল্য অবশ্যই সমগ্র দেহকে বঞ্চনা করে মুখমণ্ডলাংশে মাত্র কৃত্রিম রক্ত সঞ্চারণে)। তাই বৃহত্তর স্বার্থে মুখ্যের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কসূত্র বজায় রেখে তাকে তার নির্দিষ্ট গৌণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়। এবং ব্যক্তির তথা সমষ্টির—সুতরাং তার নিজের বিকাশের প্রতিকূল শক্তিসমূহের ক্রমবর্ধমান বিরুদ্ধতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, শুধু নিষ্ক্রিয় শিল্পসর্বস্ব আকাঙক্ষা ব্যক্ত করে নয়, বিরুদ্ধতা অতিক্রমণে সমষ্টির সকল প্রগতিশীল মুখ্য কর্মতৎপরতায় তার সেই নিজস্ব ভূমিকাটিকে দ্বিধাহীন সক্রিয় করে তুলতে হয়। সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে অস্তিত্বের সম্ভাবনাময় প্রগতিশীল বিকাশে তাৎপর্য-ব্যঞ্জনাময় প্রেরণা দানের দায়বোধে উদ্বুদ্ধ আমাদের কবিসমাজ কবিতাকে অন্যতম উপায় হিসেবে ব্যবহার করতে সর্বদা দ্বিধাগ্রস্ত নন, বরং তীব্র সঙ্কটকালে তাঁদের উচচারণ লক্ষ্যমুখী ঋজুতায় তীব্র ও তীক্ষ্ণ :

১. অস্থানে ভূমিষ্ঠ তুই
পৃথিবীর আলো
তোকে স্পর্শ করার আগেই
তোর চোখে বানানো আন্ধার
তীক্ষ্ণ বল্লমের মত ছুঁড়ে দিয়েছিলো যে দুর্জন
আমি তাকে চিনি।

না তুই জন্মান্ধ ন’স
বানোয়াট অন্ধতার বেড়া
এই ভ্রান্তি
ভুলে যা ভুলে যা
বুকের আগুনে ক্লান্ত করতল
নে জ্বালিয়ে নে রে

জ্বলন্ত আঙুলে
বিদ্ধ কর দুই চোখ

দৃষ্টি ফিরে পাবি, তুই
মাথা তুলে দাঁড়া
দে তোর অমল দৃষ্টি মেলে দে ভুবনে।
দেখে নে শ্যামল বিভা বনানীর
বনরাজিনীলা
এই পৃথ্বী –

নদী
নারী
শস্য মাঠ চিনেনে, এবং
তারো আগে শত্রুর শিবির।'[৭০]

২. হে জড় সভ্যতা!
মৃত-সভ্যতার দাস স্ফীতমেদ শোষক সমাজ!
মানুষের অভিশাপ নিয়ে যাও আজ;
তারপর আসিলে সময়
বিশ্বময়
তোমার শৃঙ্খলগত মাংসপিণ্ডে পদাঘাত হানি'
নিয়ে যাব জাহান্নাম দ্বার-প্রান্তে টানি',
আজ এই উৎপীড়িত মৃত্যুদীর্ণ নিখিলের অভিশাপ বও:
ধ্বংস হও
তুমি ধ্বংস হও।'[৭১]

৩. 'হে কূর্ম, তোমার অন্ধকার
শঙ্কার গোপন গুহা থেকে
বের হয়ে এসো আজ মুক্তির প্রাঙ্গণে
দ্বিধাহীন মনে।
পুঞ্জীভূত বঞ্চনার সঞ্চিত আক্রোশ
দুর্বার বিক্ষোভে ফণা তুলুক সমুদ্রে খালে বিলে
সম্মুখে ডাইনে বামে প্রাণান্ত সংগ্রামে
দৃষ্টির স্বচ্ছতা ফিরে পাও,
বিজয় নির্ভর বিপ্লবীর।'[৭২]

৪. 'কে আসে সঙ্গে দেখ দেখ চেয়ে আজ:
কারখানার রাজা, লাঙলের নাবিক,
উত্তাল ঢেউয়ের শাসক উদ্যত বৈঠা হাতে মাল্লাদল,
এবং কামার কুমোর তাঁতী। এরাতো সবাই সেই
মেহনতের প্রভু, আনুগত্যে
শাণিত রক্তের ঢল হয়ে যায় বয়ে তোমাদের শিরাময় পথে পথে।
দুহাতে সরায় দ্রুত শহরের জটিল পঙ্কিল,
মধ্যবিত্ত অনড় আবিল। একে একে সকলকে নামায় মিছিলে।
ডাকে আপামর ভাইবোন। একসাথে মিলে নিশ্ছিদ্র
বিশাল শিলাদৃঢ় পাহাড় বানায়।
সেই কোটি হাত এক হাত হয়ে
মোছাবে তোমার মুখ তোমার আপন পতাকায়।'[৭৩]

৫. 'আনবিক অস্ত্রধারী পৃথিবীর দৃপ্ত শাসকেরা
নিত্য নিত্য শাণিয়ে তুলছে বোমা
না-পাম ফেলছে ভিয়েতনামে, খেলছে দাবা
মধ্যপ্রাচ্যে, আফ্রিকায়, এশিয়ার দারিদ্র্যে নিয়ত।
কতিপয় ধড়িবাজ পৃথিবীকে করেছে ভাগাড়
প্রেমহীন নিরুত্তাপ ক্রুর লোভাতুর হাতে
ঠেলে দিচ্ছে অনিবার্য স্রোতে।

কবিদের কথা শোনো
সভ্যতার অলীক মুখোশ ছিঁড়ে
ময়দানে মিছিলে চলে এসো
পরস্পরের দেহে হাত রাখো ;
দেখো : ধুক ধুক করে কিনা প্রাণ।'[৭৪]

৬. 'শ্রমিক সাম্যের মন্ত্রে কিরাতেরা উঠিয়েছে হাত
হিয়েনসাঙের দেশে শান্তি নামে দেখো প্রিয়তমা,
এশিয়ায় যারা আনে কর্মজীবী সাম্যের দাওয়াত
তাঁদের পোশাকে এসো এঁটে দিই বীরের তকোমা।
আমাদের ধর্ম হোক ফসলের সুসম বণ্টন,
পরম স্বস্তির মন্ত্রে গেয়ে ওঠো শ্রেণীর উচ্ছেদ,
এমন প্রেমের বাক্য সাহসিনী করো উচ্চারণ
যেন না ঢুকতে পারে লোকধর্মে আর ভেদাভেদ।'[৭৫]

৭. 'স্মৃতিরাই প্রশ্ন করে তীব্রতায় তীক্ষ্ণতায় শুদ্ধ উচ্চারণে…
অর্জুন কোথায় কে ? কব্জিতে জোর আছে কতটুকু
গাণ্ডীবের ছিলা ঢিল কেন ?
তীরের ফলায় মরচে শূন্য তূণ অসতর্ক লক্ষ্যভেদে অনিশ্চিত কাল
কে আছো প্রেমিক কবি ; কবিতা গাণ্ডীব হবে নারীদের চতুর্দশী মন
ষাট বছরের হীরের দৌরাত্ম্য থেকে হননের থাবা থেকে জাগবে উদ্ধার ?

কে আছো ? সুখের পাখি এনে দেবে নীরাদের উচ্ছন্ন উদ্যানে ?
আটকোটি থেকে আজ নবম কোটির অঙ্কে বয়সের দীপ্র উচ্চারণ
ক্লান্তির সঙ্গীত নয় ; পল রবসন কে আছো এখন ওহে গেয়ে
ওঠো গান
খাল কেটে নিয়ে আসা কুমীরের বন্ধুত্ব কামনা
এখন সাঙ্গ হোক ; শুরু হোক মৈত্রীর গ্রাম ও নগরের সেতুবন্ধন
নীরাদের কান্না দিয়ে ক্রোধ হোক স্পষ্টির বাঁকা তলোয়ার ;
আজকাল বড় বেশি মনে হয় সুখের পাখির ডাকে গল্পকথা বলি :
নীরা হে ! সবুজ ঘাসের বুকে লাল সিঁদুরের মতো মানচিত্র
আমার।'[৭৬]

৮. 'মুদ্রায়-মননে দ্বন্দ্ব, পরাজিত
আর বিজয়ীর মধ্যে বিপন্ন নির্বোধ শিল্প ভীত –
চোখে ইতিউতি চায় ; বীরভোগ্যা বসুন্ধরা, নারী
গলায় পরায় মালা—অর্জুনের ; জয়ী তরবারি
ইচ্ছে মতো উপভোগ করে তাকে।

মন্দভাগ্য ব'লে
অনুন্নত দেশের সন্তান তীব্র মনস্তাপে জ্ব'লে
অবৈধ বাণিজ্যে নয়, তাকে আজ—সম্মুখ সমরে
শত্রুকে পরাস্ত করে— তুলে নেবো শাশ্বতের ঘরে।।'[৭৭]

৯. 'তুমি উদ্বৃত্ত পুঁজির সেই গোপন রহস্যগুলো বলে দাও,
আমি তোমার পেছনে আছি।
যতোক্ষণ তুমি সোনালি ধানের মতো সত্য
যতোক্ষণ তুমি চায়ের পাতার মতো ঘ্রাণময়
যতোক্ষণ তুমি দৃঢ়পেশী শ্রমিকের মতো প্রতিবাদী
যতোক্ষণ তুমি মৃত্তিকার কাছে কৃষকের মতো নতমুখ,
ততোক্ষণ আমিও তোমার।
তুমি রুদ্র কাল-বোশেখীর মতো নেমে আসো।
নগরীর ওই পাপমগ্ন প্রাসাদগুলোর বুকে,
শিরস্ত্রাণ পরা শোষকের মাথার উপরে,
আমি তোমার বিজয়বার্তা করবো ঘোষণা জনপদে।

তুমি চূর্ণ করো অতিবুদ্ধিজীবীদের সেই ব্যূহ
কৃত্রিম দর্শন আর মেকি শিল্পের প্রলেপে
যে আছে আড়াল করে সত্য আর সুন্দরের মুখ।'[৭৮]

১০. 'ভাবি তুমি
ছাতিমতলার মৃদু প্রার্থনার বেদী ছেড়ে
যেতে কিনা ধূলোর সংসারে। যেতে কি
যশোর রোডে, মেলাঘরে হাসনাবাদে দুঃখ ও
ক্রোধের তাঁবুর নীচে। শোনাতে এমন গান
যোদ্ধার তরুণ দেহ পিন খোলা গ্রেনেডের মত
বিপজ্জনক হয়ে ছুটে যায় শত্রুর ঘাঁটিতে
অথবা শেখাতে তুমি পলায়নপর কবিদের
কি করে নির্ভুল গুলি ছোঁড়া যায় এল. এম. জি.
মাটিতে না রেখে।'[৭৯]

১১. 'স্রোতে-স্রোতে আবার ঘূর্ণি—
বিপন্ন নৌযাত্রায় মৃত্যুর স্তব উচচারণের আগে
এসো একবার পরিবর্তনের কথা বলি:
এই ধ্বসে-যাওয়া মাটি
আর এই জটিল জলস্রোতের বিরুদ্ধে
এসো মিলিত সবল বাধা সুউচচ করে তুলি।'[৮০]

১২. 'প্রাকৃতিক ঘূর্ণিঝড়ের বিপরীতে সামাজিক ঘূর্ণিঝড় চাই
চাই সেই বেগবান বায়ু
যে বাতাসে পত্রবৎ উড়ে যাবে ঘৃণ্য মানুষ তার শিকড় সমেত
ঘূর্ণির হেঁচকা টানে কোমল ঘাসের মতো উঠে আসবে সুপ্রাচীন বট
হাওয়ায় পাতার মতো উড়ে যাবে তার মূলে

স্তুতি স্তব প্রার্থনার ভাষা
প্রতিষ্ঠিত ভুল সত্যের ভিত্তিমূলে
খাপ খোলা তলোয়ারের মতো ঢুকে যাবে
যুদ্ধরত কর্মজীবী মানুষের হাত

নির্ঘাত
বিদ্রোহের বিজয় হবে
জয় হবে
বর্তমানের ধ্বংস স্তূপে শ্রমিকের কৃষকের যূথবদ্ধ
যোদ্ধাবাহিনীর।’ ৮১

[ছয়]

কবিতায় এ-ভাবে যন্ত্রণার অশ্রু-রক্ত, নৈরাশ্যের দীর্ঘশ্বাস, বঞ্চনার শূন্যতা, পূর্ণতার দুর্মর আকাঙক্ষা ও অমল স্বপ্নের সঙ্গে মিশেছে কবির তৃতীয় নয়ন থেকে বর্ষিত ক্রুদ্ধ আত্মার আগুন। নিয়তিবাদে সমর্পিত নিষ্ক্রিয় ব্যক্তিচিত্তের অলৌকিক উদ্ধার-পতন-বিশ্বাসের আত্মপ্রবঞ্চনা নয়, সুচিহ্নিত সব অস্তিত্ববিনাশী প্রতিকূল শক্তির সঙ্গে অস্তিত্বের অনুকূল শক্তিসমূহের লক্ষ্যমুখী প্রতিবাদ-প্রতিরোধে উত্তপ্তরক্ত-বুদ্বুদ বিস্ফোরণধ্বনিময় এইসব শিল্পিত উচ্চারণ। আমাদের কবিতা সামাজিক ও ব্যক্তি-মানুষের অস্তিত্বের অভীষ্ট সংক্রান্ত মৌলিক শর্তাবলী থেকে মুক্ত ধবল-বিশুদ্ধ এক শিল্পানন্দসত্য নামক সংস্কারের প্রতি, ব্যক্তিসত্তারনিরপেক্ষ সর্বদায়মুক্ত এক কল্পিত কবিসত্তার প্রতি কবিমনের সনাতন মোহ-আনুগত্য-বিশ্বাসকে অপ্রমাণ করে না সত্য, তবে প্রধান প্রধান কবিদের কবিতায়-প্রমাণিত তাঁদের জীবন-ও শিল্পদায়মনস্কতার সাক্ষ্যে এই, উচ্চারণই তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে যে, বহুশোষণে বিপন্ন ও বিচ্ছিন্নতবাদে চূর্ণিত সমাজের উদ্ধারে-পুনর্গঠনে গৃহীত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিকল্পনাসমূহের ব্যর্থতার অভিশাপ কবিতাকে বহন করতে গিয়ে কবিতা তার নিজের মধ্যেই অসংখ্য পুষ্পকীটের জন্ম দিয়েছে, এবং তার মধু-গন্ধ-লাবণ্য পানশেষে উজ্জ্বল স্বর্ণকীটে রূপান্তরিত এই জীবানুপুঞ্জ হরিদ্রাভ পুষ্পপরাগরেণুর মনোহর বিভ্রম এনেছে। প্রেম, সৌন্দর্যবোধ, যৌনতা, স্মৃতি-স্বপ্ন-কল্পনা বিহার, শিল্পকলাকৌতূহল জীবনেরই এক-একটি প্রয়োজন এবং জীবন-প্রেরণাময় কবিতার উৎস, কিন্তু জীবন-অস্তিত্বের মূল প্রয়োজনের শর্তাধীনেই এগুলোর বিকাশ। সক্রিয় সামাজিক উত্তরণে দ্বিধাদুর্বল রাজনৈতিক পরিকল্পনাসমূহের কুয়াসাবৃত পটভূমিকায় আমাদের কবিতার প্রায়শ্চিত্তের অহঙ্কার তখনি উজ্জ্বল ও ঐশ্বর্য-সম্ভবা হয়ে ওঠে, গভীর সঙ্কটকালে অস্তিত্বের বিরুদ্ধশক্তিসমূহের মুখোমুখী দাঁড়িয়ে কবিতা যখন এমন নিষ্ঠুর ও দৃঢ়-সুন্দর সত্যভাষণ উচ্চারণ করে :

‘সৌন্দর্যের সাধনায় আকণ্ঠ কবির কণ্ঠ, দুই চোখ তার
সন্তোষ-বিহ্বল! শব্দ আর উপমার
নতুন নক্সায় কত আর মক্স করবো এ হাত, চারপাশে হত্যার প্রপাত!’৮২

‘স্বপ্ন নয়—এক বিপরীত সত্য আজ ধূলিতে ধূলিতে কথা বলে’ ৮৩

‘আমার যুদ্ধ এখন প্রেমের চেয়েও পরাক্রান্ত একটি নাম’ ৮৪

‘শব্দভুক পদ্যব্যবসায়ী ভীরু বঙ্গজ পুঙ্গব সব
এই মহাকাব্যের কাননে খোঁজে

নতুন বিস্ময়। কলমের সাথে আজ
কবির দুর্জয় হাতে নির্ভুল স্টেনগান কথা বলে, '৮৫

কিংবা যে কবির মানসলোক,

'কোনো একদিন গাঢ় উল্লাসে ছিঁড়ে খাবে টুঁটি
হয়তো হিংস্র নেকড়ের পাল, তবু তুলে দিয়ে দরজায় খিল
সত্তাসূর্যে যেসাসের ক্ষমা মেখে নিয়ে শুধু গড়ি উজ্জ্বল কথার মিছিল, '৮৬

এবং

'প্রায়শঃ ভাঁড়ারে পড়ে টান
অথচ স্বপ্নের নক্‌সী পিঠে প্রত্যহ আহার করি।
কবিত্বের উৎসে দোলে স্বপ্ন কিংবা দুঃস্বপ্নের ছায়া,
সুখের পাখির ডাক শুনি শুয়ে দুঃখের ছায়ায়' ৮৭

এমন সব আত্মপ্রবঞ্চনাময় ভাবনার উৎসভূমি, যখন সেখানেই, 'হায়, শান্তিপ্রিয় ভদ্রজন, এখন বলবে তারা সমস্বরে, যুদ্ধই উদ্ধার'—এমন ধারণার জন্মলাভ ঘটে, এবং যে-কবি দাবী করেন,

'কোলাহল-ভরা পৃথিবী লুপ্তির পরে অগাধ জলের শীষে
নীলিমার গায়ে লেগে থাকে স্থায়ী এক ইন্দ্রধনু—
ইন্দ্রধনু মেশিনের মতো ক্ষণে-ক্ষণে ফেলে দ্যায়
জলের ভিতরে এক-একটি মাছ, লাল নীল সোনালি রূপালি—
সেই ইন্দ্রধনু-সঞ্চারের কবি আমি' ৮৮

এবং,

'আমার সারা জীবন একটি দীঘল স্বপ্ন
স্বপ্নমহল থেকে স্বপ্নমহলে প্রবেশ
সেই স্বপ্নের ভিতরে ব'সে আমি আর-এক স্বপ্ন বুনি কবিতার' ৮৯

এমন ইন্দ্রধনু-সঞ্চারী কবির চেতনালোকে যখন কেবল ইন্দ্রধনু নয়, সূর্যের বিপরীতে পুঞ্জীভূত প্রলয় মেঘের প্রগাঢ় কৃষ্ণ ছায়া নামে, বজ্র-বিদ্যুৎ ঝড়ের তাণ্ডব-লীলায় নেমে আসে হেডিসের অন্ধকার এবং সমস্ত প্রলয়ের মধ্যে জ্বলতে থাকে এক জ্যোতির্ময় শৈব-প্রতিশ্রুতি :

'কবি
ভেঙে পড়লো ভাষা তোমার
ঐ ইন্দ্রধনুকের কাছে নয়
ফুটপাতের ঐ কুঁকড়ানো মানবীর বুকের পাঁজরায়
বেঁকেচুরে গেলো সুন্দরের গড়নপেটন
স্থাপত্যে লাগলো ঘুণপোকা
আজ তুমি নতজানু হ'লে স্বপ্নকল্পনার কাছে নয়
শতচ্ছিন্ন ওই শায়িনীর পদতলে'

'কবি
তোমার ভাষায় আজ ধূলোমাটি
ছন্দে জাগুক বাঁকাচোরা বিদ্যুৎ
এক মুঠো জুঁইফুল এক-মুঠো ভাত হয়ে যাক
তোমার চাঁদ আজ বেঁকে যাক ঐ কণ্ঠার হাড়ের মতো
সনেট আজ তার পঙক্তিসংখ্যা ভুলে যাক
সিলেব্‌ল-এর পায়ের পাতা বারবার পড়ুক শুধু ভুল জায়গায়
আজ আমার স্বপ্নকল্পনার উপর ছেঁড়া কাঁথা বিছিয়ে দাও
আজ আমার বস্তুভেদী আলবাট্রস-এর ডানা
কেবলি ব্যর্থ চেষ্টা করে ওড়বার
আজ ওই ফুটপাতের নামহীন নারী হয়ে ওঠে ইউরিডাইস আমার
আমার কবিতার কাঁধের উপর তুলে
হেডিস-এর অন্ধ তমসা থেকে
ওকে জীবনের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো আমি অর্ফিয়ুস'।[৯০]

সুতরাং এই বিশ্বাসে আপাততঃ সুস্থির থাকতে হয় যে, বিঘ্নিত, অবরুদ্ধ, শ্লথগতি সামাজিক পরিবর্তন-উত্তরণ ও মূল অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক ক্ষেত্রায়নে চিন্তা-পরিকল্পনা-পদক্ষেপের স্ববিরুদ্ধতা ও ব্যর্থতার পরিপ্রেক্ষিতে, অবরুদ্ধতা, স্ববিরুদ্ধতা ও ব্যর্থতার অভিশাপ থেকে পরিত্রাণলাভের উদ্দেশ্যে, একদিকে রুদ্ধদ্বার আত্মার ধ্যান-কেন্দ্রে সমাসীন নিমীলিত চক্ষু কবির নিরুদ্দেশ স্বপ্নাভিসার ও নীলিমাভ্রমণ, কিংবা আপনাতে আপনি নিমগ্ন ধ্বনিযাদুমুগ্ধ কবির শব্দশিল্প-লীলা-ক্রীড়া, অন্যদিকে বহু পশ্চাদবর্তী লোকবাহিনীর বহু-অগ্রবর্তী সীমান্তে কবিতার নির্জন খণ্ডপ্রান্তরে জীবনের বিরোধী শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে আয়োজিত নিঃসঙ্গ কবির শব্দ-সৈনাপত্যের ভীমাস্ত্র-মহড়া, এ-দুইয়ের ভারসাম্যের কেন্দ্রস্থলে কাব্যচেতনার যে সুস্থির ভূখণ্ড চারদশক ধরে ধীরে ধীরে জেগে উঠেছে, পরোক্ষ গৌণ ভূমিকায় অবতীর্ণ আমাদের কবিতা তার সুস্থ বিকাশ-সম্ভাবনা বৃদ্ধির জন্যে মুখ্য প্রবাহধারাবাহিত নতুন পলল-উর্বরতার প্রত্যাশায় আছে।

তথ্যনির্দেশ

১. ফিরে আসবে বলে গিয়েছিলে, দু'হাতে দুই আদিম পাথর : আহসান হাবীব
২. গিলগামেশ কাহিনী, ঐ
৩. সেই স্বপ্ন ফিরে পেলে, ঐ
৪. এবং তখনই, ঐ
৫. আমি কোনো আগন্তুক নই, ঐ
৬. প্রবাসী, আদিগন্ত নগ্ন পদধ্বনি : শামসুর রাহমান
৭. এক ধরনের অহঙ্কার, এক ধরনের অহঙ্কার : ঐ
৮. তুমি অন্তর্হিতা, দুঃসময়ের মুখোমুখি : ঐ
৯. কান্নার কাহিনী এক, আর্ত শব্দাবলী : হাসান হাফিজুর রহমান
১০. জীবনের ঘণ্টারোলে, অন্তিম শরের মতো : ঐ
১১. ঈক্ষণ, কালের কলস : আল মাহমুদ
১২. আমার সমস্ত গন্তব্যে, ঐ

১৩. মৃত মুখ, দুর্লভ দিন : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
১৪. উত্তরাধিকার, উত্তরাধিকার : শহীদ কাদরী
১৫. মানুষ বদলে যাচ্ছে, এই গৃহ এই সন্ন্যাস : মহাদেব সাহা
১৬. বনভূমির ছায়া, রাজা যায় রাজা আসে : আবুল হাসান
১৭. একবার পরাজিত হলেন, আমরা তামাটে জাতি : মুহম্মদ নূরুল হুদা
১৮. স্বীকারোক্তি, এক ধরনের অহঙ্কার : শামসুর রাহমান
১৯. শত্রু, ঐ
২০. দুঃখ পেতে থাকি, আমি অনাহারী : শামসুর রাহমান
২১. নগ্ন পটভূমিকা, লোক লোকান্তর : আল মাহমুদ
২২. প্রতিশ্রুত তীর্থে, রৌদ্রে প্রতিধ্বনি : সাযযাদ কাদির
২৩. সে নেই, ছায়া হরিণ : আহসান হাবীব
২৪. আমার শৈশব স্মৃতি, আমার ঘর নিজের বাড়ী : আবদুস সাত্তার
২৫. কিশোররূপে একজন কবির প্রতিকৃতি, নিরালোকে দিব্যরথ : শামসুর রাহমান
২৬. আত্মজৈবনিক, বিধ্বস্ত নীলিমা : ঐ
২৭. জীবনের ঘণ্টারোলে, অন্তিম শরের মতো : হাসান হাফিজুর রহমান
২৮. সেই অমৃত সময়, আর্ত শব্দাবলী : ঐ
২৯. শোকের দাঁড়কাক, বিপন্ন বিষাদ : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
৩০. কবিতা এমন, সোনালি কাবিন : আল মাহমুদ
৩১. অনিশ্চিত, 'আধুনিক কবিতা', রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত : আবু হেনা মোস্তফা কামাল
৩২. উদ্বাস্তু কবি, ঘুমের ভিতরে নিদ্রাহীন : আবদুল মান্নান সৈয়দ
৩৩. জন্মদাতার প্রতি, অসম্ভবের পায়ে : রফিক আজাদ
৩৪. উত্তরাধিকার, উত্তরাধিকার : শহীদ কাদরী
৩৫. নিঃশব্দ সংসার, রৌদ্রে প্রতিধ্বনি : সাযযাদ কাদির
৩৬. শোভাযাত্রা দ্রাবিড়ার প্রতি, শোভাযাত্রা দ্রাবিড়ার প্রতি : মুহম্মদ নূরুল হুদা
৩৭. আমার কৈশোর, আমার প্রধান প্রবণতা : রফিক আজাদ
৩৮. সেই অমৃত সময়, আর্ত শব্দাবলী : হাসান হাফিজুর রহমান
৩৯. দুঃসময়ে মুখোমুখি, দুঃসময়ে মুখোমুখি : শামসুর রাহমান
৪০. হৃদয়ের নায়ক, আর্ত শব্দাবলী : হাসান হাফিজুর রহমান
৪১. দুঃসময়ে মুখোমুখি, দুঃসময়ে মুখোমুখি : শামসুর রাহমান
৪২. যে আমার সহচর, বিধ্বস্ত নীলিমা : ঐ
৪৩. সম্পত্তি, বন্দী শিবির থেকে : ঐ
৪৪. জীবনের ঘণ্টারোলে, অন্তিম শরের মতো : হাসান হাফিজুর রহমান
৪৫. হৃদয়ের নায়ক, আর্ত শব্দাবলী : ঐ
৪৬. অন্তিম শরের মতো, অন্তিম শরের মতো : ঐ
৪৭. ভারসাম্যহীন মানুষ, অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না : আল মাহমুদ
৪৮. প্রেয়সী তোমাকে, ঐ
৪৯. আলোকোজ্জ্বল কুৎসিত নগ্নতায়, তৃষ্ণার অগ্নিতে একা : ফজল শাহাবুদ্দীন
৫০. ভস্মের সংকল্পে, শঙ্কিত আলোক : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
৫১. বৈশাখে নিজস্ব সংবাদ, 'আধুনিক কবিতা' রফিকুল ইসলাম সম্পাদিত : মহাদেব সাহা
৫২. জীবনের ঘণ্টারোলে, অন্তিম শরের মতো : হাসান হাফিজুর রহমান

৫৩. এমন একটা সময়, অদৃষ্টবাদীদের রান্নাবান্না : আল মাহমুদ
৫৪. চিঠি, 'সীমাবদ্ধ জলে, সীমিত সবুজে' : রফিক আজাদ
৫৫. অন্তরঙ্গে সবুজ সংসার, ঐ
৫৬. বিকেল আকাশের মেঘ, একক সন্ধ্যায় বসন্ত : সৈয়দ আলী আহসান
৫৭. স্বপ্নের সানুদেশে, সোনালি কাবিন : আল মাহমুদ
৫৮. সেই অমৃত সময়, আর্তশব্দাবলী : হাসান হাফিজুর রহমান
৫৯. যাত্রী, তিমিরান্তিক, সিকান্‌দার আবু জাফর
৬০. দ্বন্দ্ব, ঐ
৬১. উৎসবের আগের দিন, দু'হাতে দুই আদিম পাথর : আহসান হাবীব
৬২. যাত্রী, তিমিরান্তিক : সিকান্‌দার আবু জাফর
৬৩. স্তব্ধ মুখ, বিমুখ প্রান্তর : হাসান হাফিজুর রহমান
৬৪. ফেরার পিপাসা, কালের কলস : আল মাহমুদ
৬৫. ব্ল্যাক আউটের পূর্ণিমায়, তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা : শহীদ কাদরী
৬৬. কলম্বাস, চাষাভুষার কাব্য : নির্মলেন্দু গুণ
৬৭. এই ডাঙ্গা ছেড়ে যাই, আমরা তামাটে জাতি : মুহম্মদ নূরুল হুদা
৬৮. প্রভাত, প্রসন্ন প্রহর : সিকান্‌দার আবু জাফর
৬৯. সঞ্চয়, অনেক আকাশ : সৈয়দ আলী আহসান
৭০. রে কিশোর, দু'হাতে দুই আদিম পাথর : আহসান হাবীব
৭১. লাশ, সাত–সাগরের মাঝি : ফর্‌রুখ্‌ আহমদ
৭২. কূর্ম, নববসন্ত : আবুল হোসেন
৭৩. তোমার আপন পতাকা, যখন উদ্যত সঙ্গীন : হাসান হাফিজুর রহমান
৭৪. কবি, প্রতনু প্রত্যাশা : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
৭৫. সোনালি কাবিন, সোনালি কাবিন : আল মাহমুদ
৭৬. সুখের পাখির খোঁজে, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ঈদ-উল আজহা বিশেষ সংখ্যা : ইন্দু সাহা
৭৭. শাশ্বতের ঘরে, 'সীমাবদ্ধ জলে, সীমিত সবুজে' : রফিক আজাদ
৭৮. প্রলেতারিয়েত, চাষাভুষার কাব্য : নির্মলেন্দু গুণ
৭৯. রবীন্দ্রনাথ, কুসুমিত ইস্পাত : হুমায়ুন কবির
৮০. এক-একটি নৌযাত্রা, রৌদ্রে প্রতিধ্বনি : সাযযাদ কাদির
৮১. আমার স্বপ্ন এখন, রোদ ঝলসানো মুখ : সমুদ্র গুপ্ত
৮২. রক্তিম হৃদয় ফুল, বিমুখ প্রান্তর : হাসান হাফিজুর রহমান
৮৩. অস্ত্র আমার, যখন উদ্যত সঙ্গীন : ঐ
৮৪. এখন যুদ্ধ আমার, ঐ
৮৫. শহীদ স্মরণে, প্রতনু প্রত্যাশা : মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান
৮৬. রূপালি স্নান, 'প্রথম গান, দ্বিতীয় মৃত্যুর আগে' : শামসুর রাহমান
৮৭. স্বীকারোক্তি, এক ধরনের অহঙ্কার : ঐ
৮৮. বুদ্ধিমান প্রাণীর প্রতি কবি, ঘুমের ভিতরে নিদ্রাহীন : আবদুল মান্নান সৈয়দ
৮৯. ইমেজ, ঐ
৯০. ১৯৭৪, ঐ